গণিতের ভাণ্ড

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, এম্. এ, পি-এচ্. ডি,

১৯৪২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

আমাদের বহুমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মধ্যে গণিতের স্থান অতি উচ্চে। গণিত ব্যতীত কোন শাস্ত্রের অনুশীলনই সম্ভব নহে। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, গতি-বিজ্ঞান, প্রভৃতি বহু বিষয় গণিতের অন্তর্গত। যে কোন বিষয়েরই আলোচনা করা যায়, তাহার মূলে কয়েকটি ধারণা সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এই মৌলিক ধারণাগুলির উপরেই গণিতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যা, স্থান এবং কাল এই তিনটি মৌলিক ধারণা হইতেই গণিতের সমস্ত মূল তত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাদেরই সহায়তায় গণিত বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হইয়াছে। গণিত এবং বিজ্ঞানের প্রত্যেক সত্যের সহিত, প্রত্যেক কল্পনার সহিত, প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত এবং প্রত্যেক প্রক্রিয়ার সহিত ইহারা ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে।

সংখ্যা, স্থান ও কাল, এই তিনটি মৌলিক ধারণা যেরূপে গণিতশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহারই একটা আভাস দিবার চেষ্টা করা গেল। আইন-ষ্টাইনের অপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে স্থান ও কাল সম্বন্ধে যে অভিনব মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

সূচী

গণিতের ভিত্তি

সংখ্যা

মানুষের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল জাগিয়া উঠে। ক্ষুদ্র শিশুর মানসিক ক্রমবিকাশ এবং অসভ্য জাতিসমূহের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে মানুষের সহজ কৌতূহল হইতেই বিবিধ জ্ঞানলাভের চেষ্টা প্রসূত হইয়া থাকে। প্রয়োজনের তাড়না যতই বলবতী হউক, মানুষের মনের উৎকর্ষের মূলে রহিয়াছে একটি প্রবল অদম্য জ্ঞানলিপ্সা এবং আত্মজয়ের প্রচেষ্টা, নতুবা মানুষ আজ মানুষের সম্মান পাইত না।

কোন দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইলেই, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে স্বতই নানাপ্রকার কৌতূহল জাগিয়া উঠে। একটি গাছ সম্মুখে দেখিলেই, গাছটি কত বড়, তাহার পাতাগুলি কিরূপ, ফল ও ফুল দেখিতে কেমন, উহা খাদ্য না অখাদ্য, এইরূপ গাছ কোথায় বেশি জন্মে, ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্ন মনে উঠে। এই সকল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা স্বাভাবিক। ইহার পশ্চাতে প্রয়োজনের তাড়নাও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারও পশ্চাতে আছে, মানুষের সহজাত কৌতূহল। এই জন্যই মানুষের জীবনের, তাহার কর্মপ্রচেষ্টার, তাহার সাধনার কতটুকু শুধু প্রয়োজনের তাগিদ, আর কতটুকু বিশুদ্ধ আত্মবিকাশের সহজ স্ফুরণ, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

পরিদৃষ্ট বস্তু কতগুলি—এই প্রশ্নটি অতীব মৌলিক। এক এবং

বহুর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা মানুষের মনে আপনা আপনি প্রতিফলিত হয়। মনুষ্যেতর কোন কোন জীবের মনেও এক এবং বহুর প্রভেদ বুঝিবার শক্তি আছে এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।

সংখ্যার ধারণা

এক এবং বহুর প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মানুষের মন তৎসম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা করিতে চেষ্টিত হয়। 'এক' নির্দিষ্ট, কিন্তু 'বহু' অনির্দিষ্ট। বহুর এই অনির্দিষ্টতা দূর করিয়া বহু সম্বন্ধে মনে একটা স্পষ্ট ধারণা করিবার প্রচেষ্টা হইতেই সংখ্যার উৎপত্তি।

কোন বস্তু দৃষ্ট হইলেই তাহার সংখ্যা 'এক'। এই ধারণাটি মৌলিক। ইহা অপেক্ষা সহজতর অন্য কোন ধারণা, চিন্তা বা যুক্তি ইহার পশ্চাতে নাই। বস্তু মাত্রেরই সংখ্যা এক। এইরূপ একটি বস্তু পুনরায় অন্যত্র দৃষ্ট হইলে এই বস্তুটি এবং পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি মনে যে ধারণার সৃষ্টি করে তাহা আমরা প্রকাশ করি 'তুই' এই সংখ্যাটি দ্বারা। পুনরায় ঐরূপ বস্তু দৃষ্ট হইলে 'তিন' এই সংখ্যাটির ধারণা জন্মে। এইরূপে ক্রমশ এক, তুই, তিন, চার, প্রভৃতি সংখ্যা সম্বন্ধে মনে ধারণা হইয়া থাকে। এই মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যেই পর পর হাতের আঙুল দেখাইয়া বা পর পর মার্বেল সাজাইয়া শিশুর মনে সংখ্যার ধারণা করান যাইতে পারে।

এইরূপে যে সংখ্যাগুলির সম্বন্ধে মনে ধারণা জন্মে, তাহাদিগকে 'পূর্ণসংখ্যা' (Integer) বলা হইয়া থাকে। এই সংখ্যাগুলিকে ভাষায় ব্যবহার করিতে হইলে বিশিষ্ট চিহ্নের প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এজন্য বিভিন্ন চিহ্নাবলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ণ সংখ্যা

স্পষ্টই বুঝা যায়, সংখ্যার শেষ থাকিতে পারে না। একের পর এক, তারপর আর এক, তারপর আর এক, এইরূপে সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিবে, কখনও শেষ হইবে না। সমুদ্রতীরে একটি একটি করিয়া বালুকণা গণিয়া চলিলে তাহা শেষ করা যাইবে না, অথবা সমুদ্রের জলরাশি হইতে একটি একটি করিয়া বিন্দু গণিয়া গণিয়া ডাঙায় তুলিতে থাকিলে তাহারও কখনও শেষ হইবে না। সুতরাং এক, দুই, তিন, এমনি করিয়া গণিয়া যাইতে থাকিলে সংখ্যাও ক্রমশ বড়িয়াই চলিবে, কখনও থামিবে না।

এখন এই সংখ্যাগুলির জন্য যদি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে, এই চিহ্নগুলিরও কখনও শেষ হইবে না। অশেষ সংখ্যা ভাষায় প্রকাশ করিতে অশেষ প্রকার চিহ্ন প্রয়োজন হইবে, সুতরাং সেগুলি মনে রাখা বা আয়ত্ত করা অশেষ কষ্টকর হইবে। এই অশেষ বিড়ম্বনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটি অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার এক পক্ষে গণিতের মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই আবিষ্কারের গৌরব ভারতের।

দশমিক সংখ্যা-পাতন

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, এই কয়টি সংখ্যার জন্য নয়টি চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যখন কোন বস্তুই নাই, তখন এই অস্তিত্বের অভাবও একটি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই চিহ্নটিকে 'শূন্য' বলা হইয়া থাকে। সুতরাং মোট দশটি চিহ্ন হইল। নয়টির পরে যদি আর একটি বস্তু বেশি হয় তাহা হইলে যে দশ সংখ্যা হইল, তাহার জন্য আর একটি নূতন চিহ্ন

ব্যবহার না করিয়া 'এক' এই সংখ্যাটির পরে একটি 'শূন্য' বসাইয়া তাহা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইহার পর আর একটি বস্তু বেশি হইলে, এগারটি বস্তু হইল। এই এগার সংখ্যাটিকে প্রকাশ করা হইল একের পরে আর একটি এক লিখিয়া। এইরূপে, ছোট বড় সমস্ত সংখ্যাই, এক হইতে নয় পর্যন্ত নয়টি চিহ্ন এবং একটি শূন্য, এই দশটি চিহ্নের সাহায্যে লেখা হইয়া থাকে। এই লিখন-রীতিকে 'দশমিক সংখ্যাপাতন' (Decimal notation) বলা হয়।

সংখ্যাবোধক চিহ্ন

এই দশটি চিহ্ন বাংলায় ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ ; এবং ইংরাজিতে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. দেবনাগরী, ওড়িয়া, উর্দু, প্রভৃতি ভাষায় ইহার আকার বিভিন্ন। জাপান, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এগুলির বিভিন্ন আকার আছে। তবে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, প্রায় সকল ভাষাতে এবং প্রায় সকলপ্রকার গণিত ও বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তকে 1, 2, 3, প্রভৃতি চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল গণিতবিষয়ক ও বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রিকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনুশীলন ও গবেষণা আলোচিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ে সর্বত্র এই চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়। প্রায় সকল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সূত্রগুলিতে (formula) উক্ত চিহ্নগুলি বহুদিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বাংলা ভাষায় রচিত গণিতবিষয়ক বা বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকে উক্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হইলে কোন দোষ হইবে না। বরং কোন কোন স্থলে লিখন এবং মুদ্রণ সহজ হইবে।

সুতরাং এক, দুই, তিন প্রভৃতি পূর্ণসংখ্যাগুলিকে 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 15734 প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ভগ্নাংক

মনে করা যাক, একটি বস্তু সম্মুখে রহিয়াছে। উহাকে ঠিক মাঝখানে কাটিয়া দুই ভাগ করা গেল। সম্পূর্ণ বস্তুটিকে যদি 'এক' বলা যায়, তাহা হইলে, ঐ টুকরা দুইটিকে কি বলা যায়? আমরা বলি অর্ধেক। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ একটিকে দুই ভাগ করিয়া তাহার একভাগকে একের অর্ধেক বলা হয়। এই অর্ধেকটিকে সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হইলে $\frac{1}{2}$ এই চিহ্ন দিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এ স্থলে নিম্নস্থ পূর্ণসংখ্যাটি এককে যত ভাগ করা হইয়াছে, তাহাই নির্দেশ করে, এবং উপরস্থ সংখ্যাটি সেই ভাগগুলির কয়টি, তাহাই নির্দেশ করে। এইরূপে $\frac{1}{3}$ এই চিহ্নটির অর্থ তিনভাগের এক ভাগ, $\frac{2}{5}$ এর অর্থ পাঁচ ভাগের দুই ভাগ, $\frac{8}{13}$ এর অর্থ তের ভাগের আট ভাগ, ইত্যাদি। একটি বস্তুকে পাঁচ ভাগ করিয়া তাহা হইতে দুই ভাগ লইলে যতটুকু লওয়া হয়, ঐরূপ দুইটি বস্তু একত্র করিয়া ঐ একত্রিত বস্তুটিকে পাঁচ ভাগ করিলেও ঠিক ততটুকুই লওয়া হয়; সুতরাং $\frac{2}{5}$ এর অর্থ দুইটি বস্তুর একপঞ্চমাংশ, এরূপও মনে করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে 2 এবং 5 এর মধ্যে যে দাগটি দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ 'ভাগ'। $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{8}{13}$, প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে 'ভগ্নাংক' (fraction) বলে। উপরের সংখ্যাটিকে 'লব' (numerator) এবং নীচের সংখ্যাটিকে 'হর' (denominator) বলা হইয়া থাকে। যে ভগ্নাংকের হর দশ বা দশের গুণিতক তাহাকে 'দশমিক' (decimal) বলে।

কোন ভগ্নাংকের হর শূন্য হইতে পারে না, অর্থাৎ কোন ভগ্নাংকের হর শূন্য হইলে, তাহার কোন অর্থ থাকে না।

$\frac{6}{3}$ সংখ্যাটি দেখিতে ভগ্নাংক হইলেও আসলে এটি পূর্ণসংখ্যা, কারণ ইহার লব ও হরকে তিন দিয়া ভাগ করিলে $\frac{2}{1}$ অথবা 2 হয়। $\frac{8}{12}$ ভগ্নাংকটিকে সরল করিলে $\frac{2}{3}$ হয় ; কারণ হর ও লব উভয়কেই 4 দিয়া ভাগ করা যায়। সুতরাং $\frac{2}{3}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{40}{60}$, প্রভৃতি ভগ্নাংকগুলি পরস্পর সমান। যখন কোন ভগ্নাংকের লব ও হরের সাধারণ গুণক (factor) থাকে না, তখন তাহাকে আর সরল করা যায় না।

আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ কার্যনির্বাহের পক্ষে এই পূর্ণসংখ্যা এবং ভগ্নাংকের ব্যবহারই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্র যেমন বাড়িয়া চলে, তাহার বুদ্ধিও তেমনি নানা দিকে বিকশিত হইতে থাকে। গণিতের ক্ষেত্রেও তেমনি সংখ্যার অর্থ, প্রকার এবং ব্যবহার ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

ধন ও ঋণ সংখ্যা

মনে করা যাক, এক ব্যক্তি একটি সোজা পথের একস্থান হইতে একদিকে পাঁচ মাইল হাঁটিয়া গেল, তারপর আবার সেই পথে পাঁচ মাইল ফিরিয়া আসিল। প্রথম স্থানটির নাম যদি হয় ক এবং দ্বিতীয় স্থানটির নাম যদি হয় খ, তাহা হইলে ক হইতে খ-এর দূরত্বকে 'কখ' বলা যাইতে পারে। এই দূরত্ব পাঁচ মাইল। আবার খ হইতে ক-এর দূরত্বকে 'খক' বলা যাইতে পারে ; এই দূরত্বও পাঁচ মাইল। উক্ত ব্যক্তিটি প্রথমে হাঁটিয়াছে পাঁচ মাইল, তারপরে আবার হাঁটিয়াছে পাঁচ মাইল ; সুতরাং তাহার হাঁটা হইয়াছে মোট দশ মাইল। কিন্তু সে মোটের উপর গিয়াছে কতদূর? প্রথমে পাঁচ মাইল

গিয়া, পুনরায় উল্টাদিকে পাঁচ মাইল আসাতে মোটের উপর তাহার কোথাও যাওয়া হয় নাই। সে ক-তেই আছে। সুতরাং ক হইতে তাহার দূরত্ব শূন্য। এই যে ব্যাপারটি—সে হাঁটিল দশ মাইল, অথচ তাহার যাওয়া হইল না কোথাও,—এটা গণিতের সাহায্যে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, কখ যদি হয় পাঁচ, তাহা হইলে খক 'উল্টা পাঁচ,' সুতরাং এই পাঁচ আর উল্টা পাঁচ একত্রে শূন্য হইয়া গেল। এই উল্টা পাঁচ একটি 'ঋণসংখ্যা' (negative quantity) ; আর কখ যে পাঁচ সেই পাঁচটি একটি 'ধনসংখ্যা' (positive quantity)।

অনেকস্থলেই এইরূপ সোজা সংখ্যা এবং উল্টা সংখ্যার ব্যবহার আবশ্যক হইয়া থাকে। কোনস্থান হইতে পূর্বদিকে যদি দশ হাত একটি দূরত্ব মাপা হয়, তাহা হইলে, পশ্চিমদিকে মাপা দশ হাত তাহার বিপরীত হইবে। প্রথমটি যদি হয় 'দশ', তাহা হইলে অপরটি হইবে 'উল্টা দশ'। প্রথমটি যদি হয় ধনসংখ্যা, অপরটি হইবে ঋণ-সংখ্যা। যদি আট টাকা জমা হয়, এবং পরে আট টাকা খরচ হয়, তাহা হইলে জমা আট টাকাকে যে 'আট' দিয়া লেখা হয় তাহাকে ধনসংখ্যা এবং খরচ আট টাকাকে যে 'আট' দিয়া লেখা হয় তাহাকে ঋণসংখ্যা বলা হয়। ধন আট এবং ঋণ আট, উভয়ে মিলিয়া শূন্য হয়। কোন স্থানের উত্তাপ যদি দশ ডিগ্রি বাড়ে তবে তাহাকে ধন দশ দ্বারা এবং যদি পাঁচ ডিগ্রি কমে, তবে তাহাকে ঋণ পাঁচ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ধন দশ এবং ঋণ পাঁচ উভয়ে মিলিয়া মোট ধন পাঁচ হইল ; অর্থাৎ মোটের উপর পাঁচ ডিগ্রি তাপ বাড়িল। কেহ যদি মনুমেণ্টের সিঁড়ি বাহিয়া একশত ফুট উপরে ওঠে, তবে তাহা ধন

একশত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে, আর যদি কুড়ি ফুট নামিয়া আসে, তবে তাহা ঋণ কুড়ি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। মোটের উপর উহার উঠা হইল আশি ফুট; অর্থাৎ ধন একশত এবং ঋণ কুড়ি উভয়ে মিলিয়া ধন আশি হইল। একটি বাড়ির তেতলা হইতে যদি কেহ লিফ্‌টে উঠিয়া পনের ফুট উপরে চারতলায় যায়, তাহা হইলে এই উপরের দিকের পনের ফুটকে ধন পনের দিয়া প্রকাশ করা যায়। আবার যদি ঐ ব্যক্তি চারতলা হইতে একতলায় অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ফুট, নীচে নামিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার মোট নামা হইল ত্রিশ ফুট ; অর্থাৎ ধন পনের এবং ঋণ পঁয়তাল্লিশ উভয়ে মিলিয়া ঋণ ত্রিশ ফুট হইল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধন পাঁচ এবং ঋণ পাঁচ উভয়ে মিলিয়া শূন্য হয়। আবার পাঁচ হইতে পাঁচ বিয়োগ করিলেও শূন্য হয়।

ঋণ সংখ্যার যোগ

সুতরাং ধন পাঁচের সহিত, ঋণ পাঁচ যোগ করা আর ধন পাঁচ বিয়োগ করা, একই কথা। অর্থাৎ (ধন পাঁচ) $+$(ঋণ পাঁচ)$=$(ধন পাঁচ)$-$(ধন পাঁচ)। অর্থাৎ, (ঋণ পাঁচ)$=-$(ধন পাঁচ)। সুতরাং ঋণ পাঁচকে -5 এইরূপে লেখা যাইতে পারে।

এইরূপ, পূর্বদিকের দশহাত যদি হয় $+10$, তাহা হইলে পশ্চিম-দিকের দশহাত -10 ; যদি জমা আট টাকা হয় $+8$, তাহা হইলে খরচ আট টাকা -8 ; যদি উত্তাপের দশ ডিগ্রি বৃদ্ধি হয় $+10$, তাহা হইলে পাঁচ ডিগ্রি হ্রাস হইবে -5 ; যদি মনুমেণ্টের উপরের দিকের একশত ফুট হয় $+100$, তাহা হইলে নীচের দিকের পঞ্চাশ ফুট হইবে -50 ; যদি লিফ্‌টের উপরের দিকের পনের ফুট ওঠাকে

বলা যায় $+15$, তাহা হইলে নীচের দিকের পঁয়তাল্লিশ ফুট নামাকে বলিতে হইবে -45.

ধন পাঁচ এবং ঋণ পাঁচ উভয়ে মিলিয়া শূন্য হয়; অতএব $5-5=0$. ধন দশ ও ঋণ দশ উভয়ে মিলিয়া শূন্য হয়; অতএব $10-10=0$. ধন দশ ও ঋণ পাঁচ উভয়ে মিলিয়া ধন পাঁচ হয়; অতএব $10-5=5$. ধন পনের এবং ঋণ পঁয়তাল্লিশ উভয়ে মিলিয়া ঋণ তিরিশ হয়; সুতরাং $15-45=-30$.

ঋণ সংখ্যার বিয়োগ

কোন জিনিষ দুইবার উল্টাইলে সোজা হইয়া যায়। কখ দূরত্বটি ধন হইলে খক দূরত্বটি উহার উল্টা অর্থাৎ ঋণ। সুতরাং,

খক = ঋণ (কখ)

খক দূরত্বটিকে উল্টাইলে আবার কখ হয়। সুতরাং,

কখ = ঋণ (খক) = ঋণ(ঋণ কখ)

কখ যদি পাঁচ হয়, তাহা হইলে $5=-(-5)$। এইরূপে, $7-(-5)=7+5$. অতএব দেখা যাইতেছে যে ঋণসংখ্যা বিয়োগ করা এবং সেই ধনসংখ্যা যোগ করা সমান কথা।

কোন সংখ্যাকে এক দিয়া গুণ করিলে সংখ্যাটি তাহাই থাকে। কারণ, কোন সংখ্যাকে এক দিয়া গুণ করার অর্থ এই যে ঐ সংখ্যাটিকে একবার লওয়া হইল। যেমন $5\times1=5$। এইরূপে $(-1)\times1=-1$। আবার এককে দুই দিয়া গুণ করাও যা, দুইকে এক দিয়া গুণ করাও তাই। কারণ, একটি জিনিষ দুইবার লওয়াও যা, সেইরূপ দুইটি জিনিষ একবার লওয়াও তাই। এইরূপে, -1 কে এক দিয়া

ঋণ সংখ্যার গুণ

গুণ করিলে গুণফল যাহা হইবে, এককে -1 দিয়া গুণ করিলেও তাহাই হইবে। অতএব, $1\times(-1)=-1$। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এককে ঋণ এক দিয়া গুণ করিলে ঋণ এক হয়। এইরূপে 2 কে ঋণ এক দিয়া গুণ করিলে ঋণ দুই হইবে। মোটকথা, কোন সংখ্যাকে ঋণ এক দিয়া গুণ করিলে ঋণ সেই সংখ্যা হইবে। অতএব, $5\times(-1)=-5$; $6\times(-1)=-6$; $5\times(-3)=5\times3\times(-1)=15\times(-1)=-15$; $(-5)\times(-3)=(-1)\times5\times(-3)=(-1)(-15)=-(-15)=+15$ ইত্যাদি।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যদি a এবং b দুইটি সংখ্যা হয়, তাহা হইলে $a\times(-b)=-ab$, $(-a)(-b)=ab$. ধনচিহ্ন $+$ এবং ঋণচিহ্ন $-$, এই দুইটিকে যথাক্রমে 'যুক্ত' ও 'বিযুক্ত' বলা হইয়া থাকে।

ভাগ গুণের বিপরীত প্রক্রিয়া। দশকে পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে দুই হয়, ইহার অর্থ এই যে পাঁচকে দুই দিয়া গুণ করিলে দশ হয়।

ঋণ সংখ্যার ভাগ

সুতরাং $a\div b=c$, ইহার অর্থ এই যে bকে c দিয়া গুণ করিলে a হয়। এখন দেখা যাউক, দশকে ঋণ পাঁচ বা বিযুক্ত পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে কি হয়। মনে করা যাক যে দশকে ঋণ পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে x হয়। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, ঋণ পাঁচকে x দিয়া গুণ করিলে দশ হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ঋণ পাঁচকে ঋণ দুই দিয়া গুণ করিলে তবে ধন দশ হয়। অতএব x নিশ্চয়ই ঋণ দুই। অর্থাৎ, $10\div(-5)=-2$. অথবা $\frac{10}{-5}=-2$, এইরূপে, $\frac{12}{-3}=-4$, $\frac{-15}{-3}$

$=\frac{(-1)\times 15}{-3}=(-1)\times\frac{15}{-3}=(-1)\times(-5)=5.$ সাধারণভাবে বলা যায় যে, যদি a এবং b দুইটি সংখ্যা হয়, তাহা হইলে,

$$\frac{a}{-b}=-\left(\frac{a}{b}\right);\ \frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}.$$

অতএব ঋণসংখ্যা কাহাকে বলে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপে যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ এই চারটি মৌলিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যাইতে পারে, তাহা স্থিরীকৃত হইল। গণিতে অন্যান্য যে সকল প্রক্রিয়া আছে, তাহার মূলে এই চারটি প্রক্রিয়া। সুতরাং কোন সংখ্যা দ্বারা এই চারটি প্রক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহা সম্যক্ বুঝা গেলে, অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলিও তদনুসারে বুঝা যাইবে।

ঋণসংখ্যা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঋণসংখ্যা পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংক দুইই হইতে পারে। কখ দূরত্বটি যদি পৌণে এক মাইল হয়, তাহা হইলে খক দূরত্বটি ঋণ পৌণে এক মাইল হইবে, অর্থাৎ $-\frac{3}{4}$ মাইল হইবে। এস্থলে $-\frac{3}{4}$ একটি ঋণ ভগ্নাংক (negative fraction).

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন একটি সংখ্যা ধন অথবা ঋণ, পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংক হইতে পারে।

মনে করা যাক, a এবং b দুইটি পূর্ণসংখ্যা। ইহাদের যে কোন একটি, অথবা উভয়েই ধন বা ঋণ হইতে পারে। এই দুইটি সংখ্যা হইতে $\frac{a}{b}$ এই ভগ্নাংকটি পাওয়া যায়। এইরূপে যে কোন দুইটি ধন বা ঋণ সংখ্যা হইতে যে ভগ্নাংক উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'যৌক্তিক' সংখ্যা (Rational number) বলা হয়।

যৌক্তিক সংখ্যা

$\frac{1}{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{6}{7}$ প্রভৃতি সংখ্যা যৌক্তিক সংখ্যা। আবার, $\frac{-2}{3}$, $\frac{-3}{5}$, $-\frac{5}{7}$, $\frac{-7}{-2}$, প্রভৃতি সংখ্যাও যৌক্তিক সংখ্যা।

শুধু কথা, বর্ণনা, যুক্তি প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক সময়ে চিত্র সহজে বুঝা যায়। একখানি জাহাজের বর্ণনা শুনিয়া তৎসম্বন্ধে যে ধারণা হয়, জাহাজের একখানি ছবি দেখিলে তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল ধারণা হয়। এইরূপ বহু বস্তু ও বহু বিষয় আছে, যাহার ধারণার পক্ষে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় খুব সাহায্য করে। আমরা সংখ্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিতেছি, ইহারও কতকগুলি বিষয় একপ্রকার চিত্র-দ্বারা বুঝিতে সহজ হয়।

মনে করা যাক, কাগজের উপর একটি বিন্দু লওয়া গেল। এই বিন্দুর উপর দিয়া বাঁদিক হইতে ডানদিকে একটি রেখা টানা গেল।

X′ B′ C′ A′ O A C B X
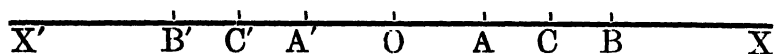
বিন্দুটিকে O এবং রেখাটিকে X′OX বলা যাইতে পারে। এখন O হইতে ডানদিকে যে কোন একটি দৈর্ঘ্য OA মাপিয়া লইয়া A-তে একটি বিন্দু বসান যাইতে পারে। এই দৈর্ঘ্যটিকে 'এক' মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এক ফুট, এক গজ, এক মাইল, এক টাকা, এক মন, এক সেকেণ্ড, এক যাহাই হউক না কেন, তাহাকে OA এই রেখাদ্বারা দেখান যাইতে পারে। অতএব OA রেখাটিকে বা দৈর্ঘ্যটিকে 'এক' এই সংখ্যার চিত্র বলা যাইতে পারে। যদি OB দৈর্ঘ্যটি OA-এর দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে OB 'দুই' সংখ্যাটির চিত্র হইবে। AC যদি ABএর

সংখ্যা চিত্র

অর্ধেক হয়, তাহা হইলে OC রেখাটি $\frac{3}{2}$ এর চিত্র। এইরূপে OX রেখাটির উপর বিভিন্ন দৈর্ঘ্যদ্বারা বিভিন্ন সংখ্যা চিত্রিত করা যাইতে পারে।

O হইতে ডানদিকে না গিয়া যদি বাঁদিকে একটি বিন্দু A′ লওয়া যায়, আর OA′ যদি OAএর সমান হয়, তাহা হইলে OA′কে 'ঋণ এক'এর চিত্র বলা যাইতে পারে। সুতরাং যদি $OA=1$ হয়, তাহা হইলে $OA'=-1$. এইরূপে যদি OB′ এর দৈর্ঘ্য OB এর সমান হয়, তাহা হইলে OB′ বুঝাইবে -2. আবার OC′ এর দৈর্ঘ্য যদি OC এর সমান হয়, তাহা হইলে OC′ বুঝাইবে $-\frac{3}{2}$।

এইরূপে O এর ডানদিকের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিভিন্ন ধন সংখ্যা (পূর্ণ বা ভগ্ন) এবং O এর বাঁদিকের দৈর্ঘ্যগুলি বিভিন্ন ঋণসংখ্যা (পূর্ণ বা ভগ্ন) বুঝাইবে। সুতরাং সমস্ত ঋণ ও ধন, পূর্ণ ও ভগ্ন সংখ্যা X′OX এই রেখার উপর বিভিন্ন দৈর্ঘ্য দ্বারা চিত্রিত করা যায়।

এই চিত্রটিকেই একটু অন্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। OA, OB, OC প্রভৃতি দৈর্ঘ্যগুলি যেমন সংখ্যা বুঝাইতে পারে, তেমনি A,B,C প্রভৃতি বিন্দুগুলিও ঠিক ঐ সংখ্যাগুলি বুঝাইতে পারে। A বিন্দুটি এক, B বিন্দুটি দুই, C বিন্দুটি $1\frac{1}{2}$ বুঝাইতেছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং ধন অথবা ঋণ, পূর্ণ অথবা ভগ্ন যে কোন সংখ্যা X′OX এই রেখার উপর এক একটি বিন্দু দ্বারা চিত্রিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার বিপরীত কথাটি কিন্তু ঠিক নয়; অর্থাৎ X′OX এই রেখার উপর যে কোন একটি বিন্দু লইলে, তাহা একটি ঋণ বা ধন, ভগ্ন বা পূর্ণ সংখ্যা বুঝাইবে, এ কথা সত্য নয়। কেন সত্য নয় তাহা পরবর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে।

যদি A হয় এক এবং B হয় দুই, তাহা হইলে এক এবং দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{5}$, $1\frac{2}{3}$ প্রভৃতি সংখ্যাগুলির চিত্রবিন্দুগুলি A এবং B এর মধ্যে থাকিবে। এক এবং দুইএর মধ্যে অসংখ্য সংখ্যা আছে; তেমনি A এবং B এর মধ্যে অসংখ্য বিন্দু আছে। শুধু এক এবং দুই কেন, পাঁচ এবং ছয়ের মধ্যেও 5·1, 5·2, 5·37 প্রভৃতি অগণিত সংখ্যা আছে; তেমনি উপরোক্ত চিত্রে পাঁচের বিন্দু এবং ছয়ের বিন্দুর মধ্যে অগণিত বিন্দু আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে কোন দুইটি সংখ্যার (পূর্ণই হউক বা ভগ্নই হউক) মধ্যে অগণিত সংখ্যা বসান যাইতে পারে; এবং উপরোক্ত চিত্রে ঐ দুইটি সংখ্যার বিন্দু দুইটির মধ্যে বিভিন্ন অগণিত বিন্দুদ্বারা ঐ সংখ্যাগুলি চিত্রিত করা যায়। সংখ্যা দুইটি যতই নিকটবর্ত্তী হউক না কেন, একথা সর্ব্বত্রই খাটিবে। 1 এবং 1·00001 খুব নিকটবর্ত্তী সংখ্যা। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও 1·000001, 1·000003, প্রভৃতি অগণিত সংখ্যা আছে। উপরোক্ত চিত্রে এই সংখ্যাগুলির বিন্দু 1 এবং 1·00001 এর বিন্দুর মধ্যে থাকিবে। একটি রেখার উপর যে কোন দুইটি বিন্দুর মধ্যে অগণিত বিন্দুদ্বারা অগণিত পূর্ণ বা ভগ্ন সংখ্যা চিত্রিত করা যায়, একথা হইতে আপাতত মনে হয় যে ঐ সকল অগণিত বিন্দুদ্বারাই সরল রেখাটি গঠিত। অর্থাৎ উক্ত সরলরেখাস্থিত সমস্ত বিন্দুই কোন না কোন ভগ্ন বা পূর্ণ সংখ্যা বুঝায়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যে কোন দুইটি বিন্দুর মধ্যে পূর্ণ ও ভগ্নসংখ্যানির্দ্দেশক অগণিত বিন্দু বসাইলেও সরল রেখাটি ভরিয়া যায় না, অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়।

মনে করা যাক, ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ। ইহার বাহুদ্বয়

প্রত্যেকটি 1. তাহা হইলে ইহার কর্ণ BC $=\sqrt{2}$. এখন পূর্বোক্ত

X' O S P Q T R X

X'OX রেখাটির উপর O হইতে আরম্ভ করিয়া ডানদিকে যদি BC এর সমান একটি রেখা টানা যায় তাহা হইলে এই রেখাটির (OP) দৈর্ঘ্য হইবে $\sqrt{2}$. সুতরাং OP এই দৈর্ঘ্যটি $\sqrt{2}$ এই সংখ্যাটি চিত্রিত করিতেছে। অথবা, P এই বিন্দুটি $\sqrt{2}$ এই সংখ্যাটি নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু $\sqrt{2}$ সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যাও নহে, ভগ্নাংকও নহে। এইরূপ, DEF এই

অযৌক্তিক সংখ্যা
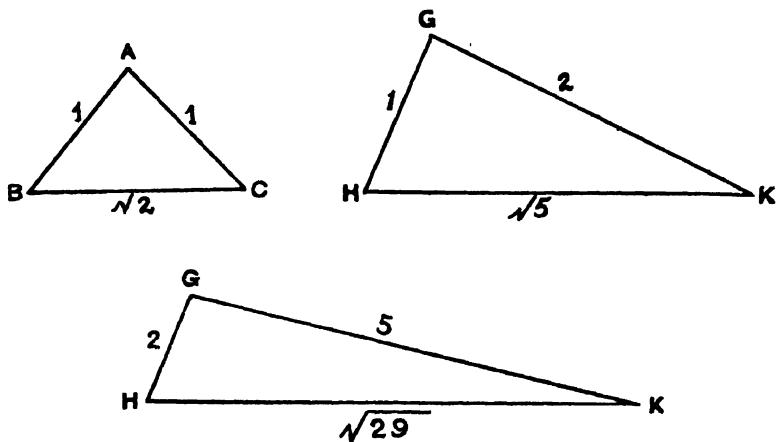
সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণ EF $=\sqrt{5}$। OQ যদি EFএর সমান হয়, তাহা হইলে Q বিন্দুটি $\sqrt{5}$ সংখ্যাটি নির্দেশ করিবে; $\sqrt{5}$ পূর্ণ সংখ্যা অথবা ভগ্নাংক নয়। GHK ত্রিভুজটির কর্ণ HK $=\sqrt{(29)}$. OR যদি HK এর সমান হয়, তাহা হইলে R বিন্দুটি $\sqrt{(29)}$ নির্দেশ করিতেছে; $\sqrt{(29)}$ সংখ্যাটিও পূর্ণও নহে ভগ্নাংকও নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে X'OXএর উপর এমন অনেক

বিন্দু আছে, যে গুলি পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংক নির্দেশ করে না এই সংখ্যাগুলিকে 'অযৌক্তিক' (irrational) সংখ্যা বলা যায়।
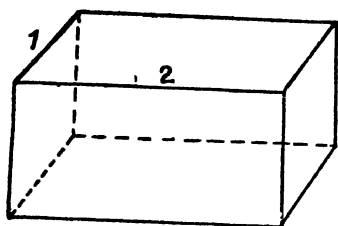
(ক)
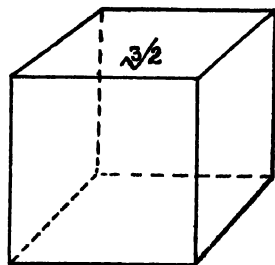
(খ)

মনে করা যাক (ক) একখানি কাঁচা ইট। ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ যথাক্রমে 2, 1 এবং 1 ফুট। তাহা হইলে আয়তন (volume) $2 \times 1 \times 1 = 2$ ঘন ফুট। এই ইটখানি ভাঙ্গিয়া সেই মাটি দিয়া যদি আর একটি ইট (খ) গড়া যায়, যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সমান, তাহা হইলে ইহার আয়তনও 2 ঘন ফুটই হইবে। যদি এই শেষোক্ত ইটখানির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ x ধরা যায় তাহা হইলে $x^3 = 2$, অথবা $x = \sqrt[3]{2}$. OX রেখার উপর যদি xএর সমান OS দৈর্ঘ্যটি লওয়া যায়, তাহা হইলে S বিন্দুটি $\sqrt[3]{2}$ নির্দেশ করিবে; $\sqrt[3]{2}$ পূর্ণ সংখ্যাও নহে, ভগ্নাংকও নহে। সুতরাং S বিন্দুটি একটি অযৌক্তিক সংখ্যা নির্দেশ করিতেছে।

মনে করা যাক, একগাছি সূতা দিয়া একটি বৃত্ত প্রস্তুত করা গেল। এই বৃত্তটির ব্যাস MN যদি এক ফুট হয়, তাহা হইলে সূতাগাছি খুলিয়া লম্বা করিলে তাহার দৈর্ঘ্য হইবে তিন ফুট অপেক্ষা একটু বেশি। এই দৈর্ঘ্যটিকে কোন পূর্ণ বা ভগ্ন সংখ্যাদ্বারা নির্দেশ

করা যায় না। এই সংখ্যাটিকে π বলা হয়। ইহাও একটি অযৌক্তিক সংখ্যা। উপরোক্ত X'OX রেখায় T বিন্দু এই সংখ্যাটি নির্দেশ করিতেছে।
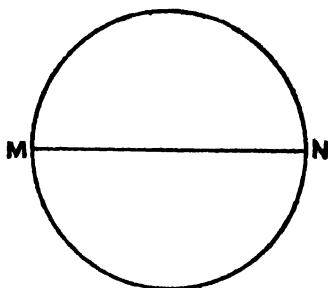
দেখা যাইতেছে যে $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{(29)}$, $\sqrt[3]{2}$, π প্রভৃতি অযৌক্তিক সংখ্যা। এগুলি পূর্ণসংখ্যাও নহে, ভগ্নাংকও নহে। X'OX রেখার উপর P, Q, R, S, T, প্রভৃতি বিন্দুগুলি উক্ত অযৌক্তিক সংখ্যাসমূহ নির্দেশ করিতেছে। উপরোক্ত অযৌক্তিক সংখ্যাসমূহ ব্যতীত আরও বহুপ্রকার অযৌক্তিক সংখ্যা আছে। ইহাদের সংখ্যাও অগণিত। এই অগণিত পূর্ণ ও ভগ্ন সংখ্যা অর্থাৎ যৌক্তিক সংখ্যা, এবং অগণিত অযৌক্তিক সংখ্যা লইয়া যে সমগ্র সংখ্যারাশি নির্ণীত হইল, তাহাকে বাস্তব (real) সংখ্যা বলে। যে কোন বাস্তব সংখ্যা, হয় যৌক্তিক নতুবা অযৌক্তিক। X'OXএর উপর যে কোন বিন্দু লইলে তাহা হয় একটি যৌক্তিক, অথবা একটি অযৌক্তিক সংখ্যা বুঝাইবে। ইহার উপর এমন কোন বিন্দু নাই, যাহা যৌক্তিক এবং অযৌক্তিক সংখ্যার বাহিরে অন্য কোন প্রকার সংখ্যা বুঝাইতে

বাস্তব সংখ্যানিধি

পারে। এই বাস্তব সংখ্যা সমষ্টিকে বাস্তব বা পাটীয় সংখ্যানিধি (real or arithmetical continuum) বলা যাইতে পারে।

মোজা, জুতা, ইয়ারিং প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ আমরা জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করিয়া থাকি। তেমনি গণিতে এক শ্রেণীর সংখ্যা আছে যেগুলি জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে বিভিন্ন প্রকারে লেখা হইয়া থাকে। একপ্রকার লিখন-রীতি এই—(1, 2), (3, −7), (11, 0), (0, −8), (x, y), (a, b), ইত্যাদি। যে কোন

জটিল সংখ্যা

সংখ্যা গণিতে ব্যবহার করিতে হইলে, তাহাদের যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ করিবার নিয়ম জানা দরকার। উপরোক্ত সংখ্যাযুগ্ম সকলের যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে।

যোগ

$$(x, y)+(a, b) = (x+a, y+b).$$

বিয়োগ

$$(x, y)-(a, b) = (x-a, y-b).$$

গুণ

$$(x, y) \quad (a, b) = (ax-by, bx+ay).$$

ভাগ

$$(x, y)\div(a, b) = \left(\frac{ax+by}{a^2+b^2}, \frac{ay-bx}{a^2+b^2}\right)$$

এইরূপ সংখ্যা-যুগ্মকে 'জটিল সংখ্যা' (Complex number) বলা হইয়া থাকে। এস্থলে a, b, x, y সংখ্যাগুলি পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেকটি

বাস্তব (real) সংখ্যা। উপরের নিয়মগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে-কোন তুইটি জটিল সংখ্যার যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল এবং ভাগফলও এক একটি অনুরূপ জটিল সংখ্যা। একটি জটিল সংখ্যার অন্তর্গত সংখ্যা তুইটিকে যে কোন পর্যায়ে লিখিলে চলিবে না ; অর্থাৎ, (x, y) এবং (y, x) একই জটিল সংখ্যা নয়। একজোড়া জুতা যেমন উল্টাইয়া পরা যায় না, তেমনি জটিল সংখ্যার অন্তর্গত সংখ্যা তুইটিকেও উল্টানো যায় না।

জটিল সংখ্যাগুলিকে আরও এক প্রকারে লেখা যায়। (x, y) সংখ্যাটিকে $x+iy$, অথবা (a, b) সংখ্যাটিকে $a+bi$, এইরূপে লেখা যায়। যদি $x+0.i$ কে শুধু x এর সমান মনে করা যায় এবং $0+iy$ কে শুধু iy এর সমান মনে করা যায়, তাহা হইলে, উপরোক্ত গুণের নিয়মানুসারে

$$\begin{aligned} i^2 = ii &= (0+1i)\ (0+1i) \\ &= (0, 1)\ (0, 1) = (0.0-1.1,\ 0.1+1.0) \\ &= (-1, 0) = -1+0i = -1. \end{aligned}$$

ঠিক এইরূপেই দেখান যায় যে, $(-i)^2 = -1$. সুতরাং i এবং $-i$ এই তুইটি জটিল সংখ্যাকে -1এর বর্গমূল বলা যাইতে পারে।

সাধারণত $x+iy$ জটিল সংখ্যাটির x-কে বাস্তব অংশ এবং iy-কে কল্পিত অংশ বলা হইয়া থাকে। পূর্ণ অথবা ভগ্ন, ধন অথবা ঋণ, কোন সংখ্যার বর্গই ঋণ হইতে পারে না ; সেইজন্য i কে কল্পিত সংখ্যা বা কল্পিত রাশি বলা হয়।

কখনও কখনও জটিল সংখ্যা চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মনে করা যাক, z একটি জটিল সংখ্যা। ইহার বাস্তব অংশ x

এবং কল্পিত অংশ iy. অতএব $z= x+iy$, অথবা $z=(x, y)$. একটি বিন্দু O হইতে সমকোণে অবস্থিত দুইটি রেখা X´OX, YOY´ অঙ্কিত হইলে O হইতে OX এর উপর ON দৈর্ঘ্যটি এমনভাবে অঙ্কিত করা যায় যাহাতে ON কে x বলা যাইতে পারে। আবার N হইতে OY এর সমান্তরাল আর একটি রেখা NP টানা যায় যাহার দৈর্ঘ্য y এর সমান।
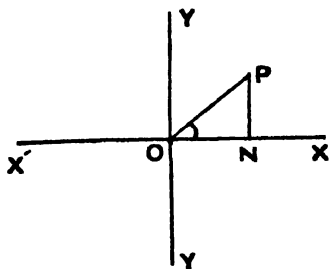
আরগাণ্ড চিত্র

সুতরাং $ON=x$, $NP=y$ হইল। এরূপস্থলে P বিন্দুটি $x+iy$ অথবা z, এই জটিল সংখ্যাটিকে নির্দেশ করিতেছে। P এর মত বিভিন্ন বিন্দু দ্বারা যাবতীয় জটিল সংখ্যা নির্দেশ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত চিত্রটি আর্গাণ্ড চিত্র (Argand diagram) নামে পরিচিত।

প্রকৃতমান ও জ্ঞাপক

OP এই দূরত্বটিকে z এর মাত্রা বা প্রকৃত মান (modulus or absolute value) বলা হয়, এবং PON কোণটিকে জ্ঞাপক (argument) বলা হইয়া থাকে।

আমরা অনেক জিনিষ ব্যবহার করি, যার অনেকগুলি একসঙ্গে ছড়ানো বা সাজানো থাকে, যেমন একপাতা আল্‌পিন, একপাতা সেফটীপিন, একপাতা বোতাম বা একগাছি মালা। তেমনি গণিতে

একপ্রকার সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে অনেকগুলি সংখ্যা একত্রে বিশেষরূপে সাজানো। যেমন,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & b \\ x & y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$ ইত্যাদি।

এইগুলিতে কতকগুলি সংখ্যা বিভিন্ন সারি (row) এবং পাটীতে (column) সাজানো। সংখ্যাগুলিকে যেমন তেমন করিয়া সাজাইলে চলিবে না। ঠিক এক প্রকারে সাজানো সংখ্যাগুলি একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিবে। যদি ইহার কোনটিতে যতগুলি পাটী আছে, ঠিক ততগুলি সারিও থাকে, তাহা হইলে এই সংখ্যা সমুদয়কে 'সংখ্যাপত্র' (Square matrix) বলা হয়; যেমন উপরোক্ত উদাহরণের প্রথম দুইটি। যদি পাটী ও সারির সংখ্যা সমান না হয়, তাহা হইলে, উহাকে 'মিশ্র-ছক' (rectangular matrix) বলা যাইতে পারে।

সংখ্যা-পত্র ও মিশ্রছক

এই সংখ্যাপত্রগুলি গণিতে ব্যবহার করিবার জন্য ইহাদের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের নিয়ম ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই নিয়মগুলি পূর্বোক্ত অন্যান্য প্রকার সংখ্যার যোগ-বিয়োগাদির নিয়ম অপেক্ষা দুরূহতর।

যোগের নিয়ম হইতে বিয়োগের নিয়ম বুঝা যায়, এবং গুণের নিয়ম হইতে ভাগের নিয়ম নির্ণয় করা যায়। নিম্নে যোগ এবং গুণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। এইগুলি হইতে যোগ এবং গুণের নিয়ম সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইবে।

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+p & b+q \\ c+r & d+s \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 14 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ap+br & aq+bs \\ cp+dr & cq+ds \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & 17 \\ 35 & 43 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 19 \\ 35 & 57 \end{bmatrix}$$

এই সংখ্যাপত্রগুলির গুণের নিয়মে একটি বিশেষত্ব আছে। ইহার পূর্বে যে সকল সংখ্যার বিষয় বলা হইয়াছে তাহাদের গুণের বেলায় x কে y দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, y কে x দিয়া গুণ করিলেও তাহাই হয়। কিন্তু এই সংখ্যাপত্রগুলির ব্যাপারে এ নিয়ম খাটে না। যদি x এবং y দুইটি সংখ্যাপত্র হয়, তাহা হইলে $x \times y$ এবং $y \times x$ সমান নয়। উপরোক্ত উদাহরণগুলির শেষোক্ত দুইটি হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

সংখ্যা-গুচ্ছ

এমন অনেক জিনিষ আছে যা আমরা গোছা গোছা করিয়া বা মুঠা মুঠা করিয়া ব্যবহার করি, যেমন, এক তোড়া ফুল, এক গোছা চাবি, এক ঝুড়ি আম, ইত্যাদি। গণিতেও তেমনি একপ্রকার সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, যেগুলি আসলে অনেকগুলি সংখ্যার বিশেষ ভাবে সাজানো একটা তোড়া। এই

সংখ্যাগুলির সবগুলিকে লইয়াই ঐ তোড়ার একটা বিশেষ অর্থ হয়। সংখ্যাগুলিকে অদল বদল করিয়া সাজাইলে সমস্ত জিনিষটাই ভিন্ন হইয়া যায়। এইপ্রকার সংখ্যাকে 'সংখ্যাগুচ্ছ' (tensor) বলা যাইতে পারে। এগুলিরও যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যে সংখ্যাগুলি লইয়া একটি সংখ্যাগুচ্ছ গঠিত হয়, সেগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ না লিখিয়া একটি সংক্ষিপ্ত আকারে সকলগুলিকেই প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যেমন, T_{11}, T_{22}, T_{33}, T_{12}, T_{23}, T_{13} এই ছয়টি সংখ্যাকে শুধু T_{pq} দিয়া প্রকাশ করা যায়। এখানে অবশ্য বুঝিয়া লইতে হইবে যে p এবং q এর মান 1, 2, 3 হইতে পারে। যদি p এবং q এর মান 1, 2, 3, 4 হইতে পারে, তাহা হইলে T_{pq} সংখ্যাগুচ্ছটি T_{11}, T_{22}, T_{33}, T_{44}, T_{12}, T_{13}, T_{14}, T_{23}, T_{24}, T_{34} এই দশটি সংখ্যা বুঝাইবে। এই উদাহরণ দুইটিতে T_{12} এবং T_{21} সমান ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে আরও মনে রাখিতে হইবে যে উক্ত সংখ্যাগুলিকে যেমন তেমন করিয়া লিখিলেই তাহাদের পরিবর্তে T_{pq} লেখা চলিবে না। T_{pq} যে সংখ্যাগুচ্ছ নির্দেশ করে, তাহাদের একটা বিশিষ্ট পর্যায় আছে এবং গণিতে ব্যবহারের জন্য তাহাদের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

উল্লিখিত কয় প্রকারের সংখ্যা ও সংখ্যাগুচ্ছ দ্বারাই গণিতের অধিকাংশ প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন গণিতীয় তত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে।

স্থান

স্থান সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আপেক্ষিক। বস্তুর সহিত ইহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। যেখানে কোন বস্তু নাই, সেখানে স্থানের কোন ধারণা সম্ভব নয়। শূন্য ঘরের ধারণা করিতে ঘরের দেওয়াল আবশ্যক। মাথার উপরে বিরাট শূন্যের ধারণা করিতে নীচে পৃথিবী এবং উপরে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আবশ্যক।

স্থান ও দূরত্ব

স্থান (space) এবং দূরত্ব (distance) একই মৌলিক ধারণার সূচক। ঘরের মধ্যে কতখানি স্থান আছে, তাহা বুঝিতে হইলে দেওয়ালগুলির দূরত্ব এবং মেঝে হইতে ছাদের দূরত্ব জানা আবশ্যক। পার্কে কতখানি স্থান আছে তাহা জানিতে হইলে, পার্কের এক পাশ হইতে অন্য পাশের দূরত্ব জানা আবশ্যক। মোটকথা আমাদের স্থানের ধারণা এবং দূরত্বের ধারণা প্রায় অভিন্ন। একটির সহিত অন্যটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

অবস্থান

স্থান এবং দূরত্ব বিষয়ে মনে কোন স্পষ্ট ধারণা করিতে গেলেই অবস্থানের (position) চিন্তা মনে আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ, কোন স্থানের কথা বা দূরত্বের কথা ভাবিতে গেলেই 'কোথায়?' এই প্রশ্নটি প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবে মনে আসিয়া পড়ে। মাঠটি কত বড়, এসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে মাঠের এপার হইতে ওপার পর্যন্ত দূরত্ব জানা দরকার। তাহা হইলে, এপারে দাঁড়াইলে ওপার কোথায় অথবা এপারের তুলনায় ওপারের অবস্থান কোথায়, তাহা জানিতে হইবে। সুতরাং স্থান, দূরত্ব

ব্যবধান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে অবস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দরকার। অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না হইলে স্থান-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে না। জগৎ ও জগতের পদার্থ বিষয়ে সঠিক স্পষ্ট ধারণাই গণিত ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। 'কতগুলি ?' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবার জন্য গণিত সংখ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে। তেমনি 'কোথায় ?' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবার জন্যই গণিত অবস্থান-তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, কোথায় বা কত দূরে, এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। যদি বলি, শ্যামবাজার কত দূরে ? তাহা হইলে সেই সঙ্গে বলিয়া দিতে হইবে, কোথা হইতে। চৌরঙ্গী রোড হইতে শ্যামবাজার যত দূরে, হ্যারিসন রোড হইতে তো তত দূরে নয়। চাঁদ কত দূরে ? কোথা হইতে তাহা বলিয়া না দিলে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। পৃথিবী হইতে চাঁদ যত দূরে, সূর্য হইতে তার চেয়ে অনেক বেশি দূরে। সুতরাং অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক।

এখন দেখা যাক্, গণিত এই অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রথমত মনে করা যাক যে নীচের X′OX রেখাটি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও কলেজ স্ট্রীটের চিত্র

অবস্থান-চিত্র

মনে করা যাক যে P বিন্দুটি ২১৩ নম্বরের বাড়িটার অবস্থান বুঝাইতেছে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ২১৩ নম্বরের বাড়িটা কোথায়? কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কোনও অংশের সহিত যাহার পরিচয় নাই, তাহাকে ২১৩ নম্বরের বাড়ি কোথায় তাহা বুঝান যাইবে না। যদি সে জানে হ্যারিসন রোডের মোড় কোথায়, তাহা হইলে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে ২১৩ নম্বরের বাড়িটা হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে এক মাইল দূরে। কিন্তু শুধু এক মাইল বলিলেও যথেষ্ট হইবে না। তাহাকে বলিতে হইবে, এক মাইল উত্তরে বা দক্ষিণে। মনে করা যাক, O হ্যারিসন রোডের মোড় আর X ইহার উত্তর দিকে এবং X′ দক্ষিণ দিকে। তাহা হইলে P এর অবস্থান O হইতে উত্তরদিকে এক মাইল দূরে। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, X′OX এর উপরের যে কোন বিন্দুর অবস্থান O হইতে নিরূপিত একটি দূরত্বদ্বারা দেখান যায় এবং এই দূরত্বটিকে একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এখানে এক মাইলের নির্দেশক 'এক' এই সংখ্যা। সুতরাং 'এক' এই সংখ্যাটি P এর অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। এখানে X′OX এই রেখাটি জানা আছে। আরও জানা আছে O বিন্দুটি। এগুলি জানা না থাকিলে 'এক' এই সংখ্যাদ্বারা P এর অবস্থান বুঝান যাইত না। যদি O বিন্দুটি ডানদিকে বা বাঁদিকে সরিয়া যায় তাহা হইলে এই সংখ্যাটিও পরিবর্তিত হইবে। O যদি হ্যারিসন রোডের মোড় না বুঝাইয়া বউবাজারের মোড় বুঝায়, তাহা হইলে ২১৩ নম্বরের বাড়ি সেখান হইতে দুই মাইল হইবে। অর্থাৎ P এর অবস্থান বুঝাইবে 'দুই' এই সংখ্যা, 'এক' নহে। সুতরাং P এর অবস্থান যে সংখ্যাদ্বারা বুঝান যায় তাহা X′OX এই রেখা এবং O এই

বিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। এই জন্যই অবস্থান-নির্দেশক সংখ্যা আপেক্ষিক। কোন স্থানের অবস্থান নির্দেশের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই।

এই অবস্থান-নির্দেশক সংখ্যাকে স্থানাঙ্ক (co-ordinate) বলে। O বিন্দুটিকে মূলবিন্দু (origin) এবং X′OX এই রেখাটিকে অক্ষ (axis) বলে। একটি রেখার উপরে অবস্থিত যত বিন্দু আছে, তাহার প্রত্যেকটির অবস্থান এক একটি সংখ্যাদ্বারা সূচিত হয়। এই সংখ্যাগুলি ঐ সকল বিন্দুর স্থানাঙ্ক।

স্থানাঙ্ক

যে স্থানের (space) প্রত্যেকটি বিন্দুর অবস্থান একটি মাত্র সংখ্যা (স্থানাঙ্ক) দ্বারা সূচিত হয়, সেই স্থানকে একমাত্রিক স্থান (one-dimensional space) বলে। একটি সরল রেখা একটি একমাত্রিক স্থান ; কারণ, ইহার উপরে অবস্থিত যে কোন বিন্দুর অবস্থান একটি মাত্র সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হয়।

একমাত্রিক স্থান

মনে করা যাক, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোথায়। যে কলিকাতার কোন স্থানই চেনে না তাহাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বা অন্য কোন বাড়ির অবস্থান বুঝান অসম্ভব। এস্থলে মনে করা যাক যে, উক্ত ব্যক্তি চৌরঙ্গী রোড এবং লোয়ার সার্কুলার রোড চেনে।

দ্বিমাত্রিক-স্থান

মনে করা যাক, X′OX চৌরঙ্গী রোড এবং YOY′ লোয়ার সার্কুলার রোড। ইহাদের সঙ্গম স্থল O. মনে করা যাক, X উত্তর-দিকে। এখন, P যদি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চিহ্ন হয়, তাহা

হইলে উক্ত ব্যক্তিকে বলা যাইতে পারে যে, লোয়ার সার্কুলার রোড এবং চৌরঙ্গীর সঙ্গমস্থল (O) হইতে চৌরঙ্গী রোড দিয়া উত্তর-দিকে চারশ' গজ (ON) আসিয়া তারপর পশ্চিমদিকে পাঁচশ' গজ (NP) গেলেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পাইবে। এখানে চারশ' গজ এবং পাঁচশ' গজ, এই দুইটি দূরত্ব দ্বারা Pএর অবস্থান নির্ণীত
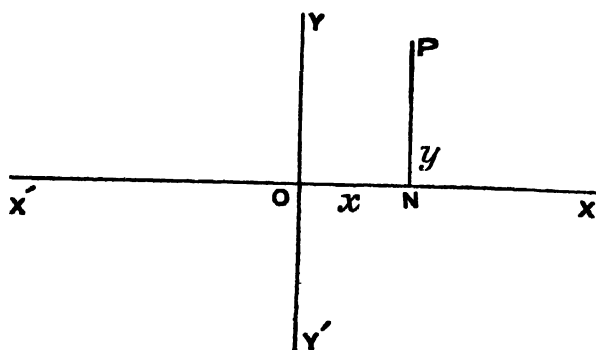
হইল। এখানে চারশ' এবং পাঁচশ' এই দুইটি সংখ্যা P বিন্দুর স্থানাঙ্ক। এইরূপে যে কোন দুইটি পরস্পর লম্বমান রাস্তা জানা থাকিলে (যেমন, চৌরঙ্গী রোড এবং লোয়ার সার্কুলার রোড), দুইটি সংখ্যাদ্বারা কলিকাতার যে কোন স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে। অর্থাৎ, X'OX এবং YOY' জানা থাকিলে যে কোন বিন্দু Pএর অবস্থান ON এবং PNএর পরিমাণ দ্বারা (অর্থাৎ x এবং y এই দুইটি সংখ্যাদ্বারা) নিরূপিত হইতে পারে। এস্থলে O বিন্দুটি মূল-বিন্দু, X'OX এবং YOY' দুইটি অক্ষ এবং x ও y দুইটি স্থানাঙ্ক। যে স্থানের (space) প্রত্যেকটি বিন্দুর অবস্থান (position) দুইটি স্থানাঙ্ক (co-ordinates) দ্বারা নিরূপিত হয়,

তাহাকে দ্বিমাত্রিক স্থান (two-dimensional space বা plane) বলে।

মনে করা যাক, দুইটি রাস্তা OX এবং OY আসিয়া O-তে মিশিয়াছে। মোড়ের কাছে একটি গাছ, গাছের উপর একটি ফল। মনে করা যাক, ফলের অবস্থান P-বিন্দুতে। ফলটি কোথায়? স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করিয়া ফলটির অবস্থান এইরূপে বুঝান যায়—রাস্তার মোড় (O) হইতে X-দিকে ছয় গজ (OA) গিয়া, সেখান হইতে OY-এর দিকে দশ গজ (AN) গেলে গাছের গোড়ায় (N) পৌঁছিবে। সেখান

ত্রিমাত্রিক স্থান
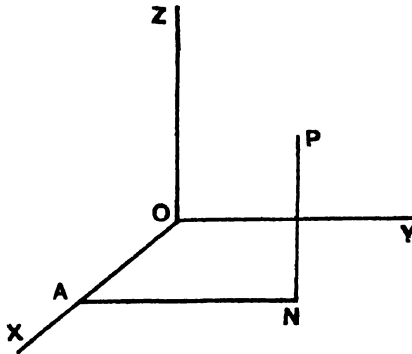
হইতে সাত গজ (NP) উপরে উঠিলে ফলের নিকট পৌঁছিতে পারিবে। এস্থলে OA, AN এবং NP এই তিনটি দূরত্ব, অথবা এই তিনটি দূরত্বের মান ছয়, দশ ও সাত এই তিনটি সংখ্যা, P-এর অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। যদি O হইতে উপর দিকে OZ রেখাটি টানা যায়, তাহা হইলে, ছয়, দশ ও সাত এই তিনটি সংখ্যা OX, OY এবং OZ এই তিনদিকের তিনটি দূরত্ব বুঝাইতেছে।

সুতরাং O-কে মূলবিন্দু ধরিলে এবং OX, OY, OZ এই তিনটি পরস্পর লম্বমান সরলরেখাকে তিনটি অক্ষ বলিয়া মনে করিলে, P বিন্দুর স্থানাঙ্ক তিনটি—ছয়, দশ এবং সাত। এইরূপে, একটি মূলবিন্দু এবং তিনটি অক্ষ জানা থাকিলে, যে কোন বিন্দুকেই তিনটি স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। যে স্থানের (space) যে কোন বিন্দু তিনটি স্থানাঙ্কের (co-ordinates) দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহাকে ত্রিমাত্রিক স্থান (three-dimensional space) বলে।

জগতের শূণ্য অথবা পূর্ণ যে স্থান আমরা লক্ষ্য করি, তাহা ত্রিমাত্রিক। আমাদের বাস ত্রিমাত্রিক স্থানে।

দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক স্থানে অবস্থিত বিন্দুর অবস্থান-নির্দেশের বিভিন্ন রীতি আছে। উপরোক্ত দুইটি উদাহরণ ব্যতীত আরও দু-একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে।

একটি দ্বিমাত্রিক স্থানে একটি বিন্দু O লওয়া যাক। O হইতে যে কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে OX রেখা টানা যাইতে পারে।

মেরুব স্থানাঙ্ক

যে কোন একটি বিন্দু Pএর অবস্থান নির্ণয় করিতে হইলে, OP এই দূরত্ব এবং POX এই কোণ, এই দুইটি জানিলেই চলে। কারণ, POX কোণটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি P কোনদিকে এবং OP দূরত্বটি হইতে
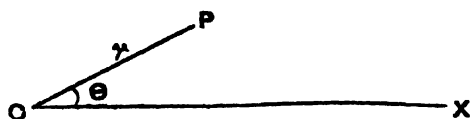
বুঝিতে পারি P কত দূরে। কোনদিকে এবং কত দূরে, জানিতে পারিলেই P কোথায় তাহা বুঝা গেল। সুতরাং OP যদি r হয়

এবং OPX কোণটি যদি θ হয়, তাহা হইলে r এবং θ এই দুইটি সংখ্যা Pএর অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। সুতরাং r এবং θ, Pএর দুইটি স্থানাঙ্ক। এরূপ স্থলে কখনও কখনও O কে মেরু (Pole) এবং OXকে আদিম রেখা (Initial line) বলা হইয়া থাকে।

একটি ত্রিমাত্রিক স্থান লওয়া যাক। যে কোন একটি মূল-বিন্দু O হইতে OX, OY, OZ তিনটি পরস্পর লম্বমান রেখা টানা যাক।
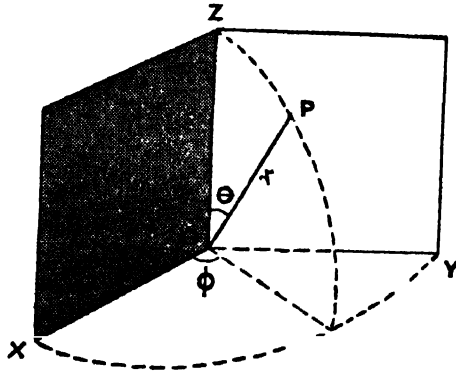
O হইতে Pএর দূরত্ব OP ; OP এবং OZ এর মধ্যে যে কোণ তাহা θ ; OP এবং OZ যে তলে (plane) অবস্থিত, এবং OX ও OZ যে তলে (plane) অবস্থিত, এই দুইটি তলের মধ্যে যে কোণ তাহা ϕ. এখন, r, θ এবং ϕ, এই তিনটি সংখ্যা জানা থাকিলে P এর অবস্থানও জানা যায়। এস্থলে (r, θ, ϕ) এই তিনটি সংখ্যা P এর তিনটি স্থানাঙ্ক। এগুলিকে গোলীয় (spherical) স্থানাঙ্ক বলা যাইতে পারে।

গোলীয় স্থানাঙ্ক

আবার মনে করা যাক, OX, OY, OZ তিনটি পরস্পর লম্বমান রেখা এবং P যে কোন একটি বিন্দু। P হইতে OZ এর দূরত্ব r ;

P হইতে XOY তলের (plane) দূরত্ব Z ; OZ ও OP যে তলে অবস্থিত এবং OZ ও OX যে তলে অবস্থিত, এই দুইটি তলের মধ্যে যে কোণ তাহা θ. এস্থলে, r, θ এবং z জানা থাকিলে P এর অবস্থান জানা যায়। সুতরাং (r, θ, z) এই তিনটি সংখ্যা P এর স্থানাঙ্ক। এই

নলীয় স্থানাঙ্ক
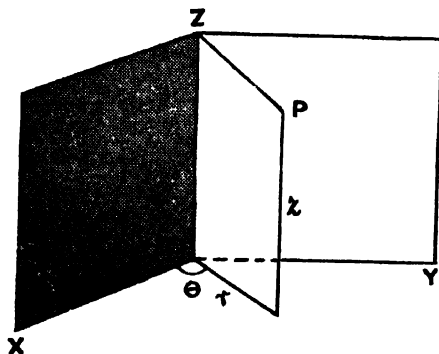
স্থানাঙ্কগুলিকে নলীয় (cylindrical) স্থানাঙ্ক বলা হয়।

এখানে যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া হইল, ইহা ব্যতীত আরও বহুপ্রকারে বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিন্দুর স্থান-নির্দেশ গণিতের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। প্রয়োজন অনুসারে বিবিধ উপায়ে এই স্থাননির্দেশ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের স্থান-নির্দেশের পন্থা এবং বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে।

দ্বিমাত্রিক স্থান বা সমতল ক্ষেত্রের দুইটি স্থানাঙ্ক x এবং y যে বিন্দুর শুধু x জানা আছে, সে বিন্দুটি O হইতে x দূরে OY এর সমান্তরাল একটি রেখার উপরে থাকিবে। এই রেখার উপরকার সব বিন্দুরই প্রথম স্থানাঙ্ক x. তেমনি, যে বিন্দুর y দেওয়া আছে,

সে বিন্দু থাকিবে O হইতে y দূরে OX এর সমান্তরাল একটি রেখার উপর। সুতরাং যে বিন্দুটির x এবং y দেওয়া আছে, তাহার অবস্থান উপরোক্ত দুইটি রেখার সঙ্গমস্থল।

মৈরব স্থানাঙ্ক r এবং θ এর বেলায়ও এইরূপ কথা খাটে। যে বিন্দুর r দেওয়া আছে, অর্থাৎ O হইতে দূরত্ব দেওয়া আছে, তাহা Oকে কেন্দ্র করিয়া এবং r ব্যাসার্ধ লইয়া যে বৃত্ত আঁকা যায়, তাহার উপরে থাকিবে। যে বিন্দুর θ দেওয়া আছে, তাহা, OXএর সহিত θ কোণ করিয়া যে রেখা আঁকা যায়, তাহার উপরে থাকিবে। সুতরাং যে বিন্দুর r এবং θ দেওয়া আছে, তাহার অবস্থান উক্ত বৃত্ত এবং উক্ত রেখার সঙ্গমস্থল।

এইরূপে দেখা যায়, যে দ্বিমাত্রিক স্থানের যে কোন বিন্দু দুইটি রেখার সঙ্গমস্থল। এক একটি স্থানাঙ্ক দ্বারা এক একটি রেখা নির্দিষ্ট হয়।

ত্রিমাত্রিক স্থানেও অনুরূপ কথা খাটে। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। মনে করা যাক, একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক x, y, z. যে বিন্দুর শুধু x দেওয়া আছে, সে বিন্দুটি YOZ এর সমান্তরাল O হইতে x দূরবর্তী একটি সমতলের (plane) উপর থাকিবে। যে বিন্দুটির y দেওয়া আছে, সেটি থাকিবে ZOX এর সমান্তরাল একটি সমতলে। যে বিন্দুটির z দেওয়া আছে, সেটি থাকিবে X O Yএর সমান্তরাল একটি সমতলে। সুতরাং যে বিন্দুটির x, y এবং z তিনটিই দেওয়া আছে, সেটি উপরোক্ত তিনটি সমতলেই থাকিবে। সুতরাং উক্ত বিন্দুর অবস্থান উপরোক্ত তিনটি সমতলের সঙ্গমস্থল।

এমনি করিয়াই দেখা যায়, যে গোলীয় স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্দিষ্ট বিন্দু

একটি গোলক (sphere), একটি শঙ্কু (cone) এবং একটি সমতলের (plane)এর সঙ্গমস্থল। কারণ যে বিন্দুর r দেওয়া আছে, তাহা আছে r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি গোলকের উপর ; যে বিন্দুর θ দেওয়া আছে, তাহা আছে 2θ-কোণ বিশিষ্ট একটি শঙ্কুর (cone) উপর ; এবং যে বিন্দুর ϕ দেওয়া আছে, তাহা আছে OZএর ভিতর দিয়া টানা একটি সমতলের উপর। সুতরাং যে বিন্দুর r, θ, ϕ দেওয়া আছে, তাহা উপরোক্ত তিনটি তলেই (surface) আছে। অর্থাৎ উক্ত বিন্দুটি উক্ত তিনটি তলের সঙ্গমস্থল।

নলীয় স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্দিষ্ট বিন্দুর অবস্থান একটি নল (cylinder) এবং দুইটি সমতলের সঙ্গমস্থল।

ত্রিমাত্রিক স্থানে অবস্থিত বিন্দুর স্থান-নির্দেশের অন্য যে সকল পন্থা আছে এবং অন্য যে সকল স্থানাঙ্ক ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সম্বন্ধেও ঠিক উপরোক্ত কথা খাটে। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনটি তলের (surface) সঙ্গমস্থল একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে এবং এক একটি স্থানাঙ্ক দ্বারা এক একটি তল (surface) নিরূপিত হয়।

বৃত্ত, সরল রেখা, সমতল, গোলক, নল, শঙ্কু, প্রভৃতি সুপরিচিত রেখা (curve) বা তল (surface) ব্যতীত অন্যান্য স্বল্প পরিচিত রেখা বা তলও এই উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোন দ্বিমাত্রিক স্থানের বিন্দুর অবস্থান একটি উপবৃত্ত (ellipse) এবং একটি পরিবৃত্তের (hyperbola) সঙ্গমস্থল দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। যে দুইটি স্থানাঙ্ক দ্বারা ইহা নিরূপিত হয়, তাহাকে 'উপবৃত্তীয় স্থানাঙ্ক' (elliptic co-ordinates) বলা হয়।

আবার ত্রিমাত্রিক স্থানের একটি বিন্দুর অবস্থান একটি উপগোলক (ellipsoid) এবং দুইটি দুই প্রকারের পরিগোলকের (Hyperboloid) সঙ্গমস্থল দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে। যে তিনটি স্থানাঙ্ক দ্বারা এই অবস্থান নির্ণীত হয়, তাহাকে উপগোলীয় (ellipsooidal) স্থানাঙ্ক বলা যাইতে পারে।

দ্বিমাত্রিক স্থানে যে দুইটি রেখা (curves) এবং ত্রিমাত্রিক স্থানে যে তিনটি তল (surface) দ্বারা বিন্দুর অবস্থান নির্ণীত হয়, সেগুলি পরস্পর সমকোণে ছেদ করে। পরস্পর সমকোণে ছেদকারী রেখা বা তল (curves or surfaces) দ্বারা যে সকল স্থানাঙ্ক স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে সমকোণীয় স্থানাঙ্ক (orthogonal co-ordinates) বলে। উপরে যতগুলি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্কের কথা বলা হইয়াছে, সবগুলিই সমকোণীয়।

বৃত্ত, সরল রেখা, গোলক প্রভৃতি বিশিষ্ট সুপরিচিত রেখা বা তলের পরিবর্তে অনেক সময়ে দুইটি বা তিনটি পরস্পর সমকোণে ছেদকারী সাধারণ রেখা বা তল লওয়া হয়। এইরূপে সাধারণ ভাবে লওয়া দুইটি (দ্বিমাত্রিক স্থানে) বা তনটি (ত্রিমাত্রিক স্থানে) রেখা বা তলের সঙ্গম স্থল যখন কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে, তখন এই বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলিকে 'সাধারণ বক্ররৈখিক সমকোণীয় স্থানাঙ্ক' (general curvilinear orthogonal co-ordinates), অথবা

সমকোণীয় স্থানাঙ্ক

সংক্ষেপে, 'সমকোণীয় স্থানাঙ্ক' (orthogonal co-ordinates) বলে। ইতিপূর্বে যতগুলি বিভিন্ন প্রকার স্থানাঙ্কের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সবগুলিই সাধারণ সমকোণীয় স্থানাঙ্কের বিশিষ্ট উদাহরণ।

আমরা দেখিয়াছি, একমাত্রিক স্থানের যে কোন বিন্দুর অবস্থান একটি সংখ্যা দ্বারা, দ্বিমাত্রিক স্থানের যে কোন বিন্দুর অবস্থান দুইটি সংখ্যা দ্বারা, এবং ত্রিমাত্রিক স্থানের যে কোন বিন্দুর অবস্থান তিনটি সংখ্যা দ্বারা নিরূপিত হয়। এই তিন প্রকার স্থানই আমাদের অনুভূতির গোচর। একটি রেখা, একটি সূতা, একটি তার, প্রভৃতি দিয়া আমরা একমাত্রিক স্থানের কল্পনা করিতে পারি। একখানি কাগজ, একটি ঘরে, মেঝে, একটি মাঠ, প্রভৃতি দিয়া আমরা দ্বিমাত্রিক স্থানের কল্পনা করিতে পারি। জগতের সকল বস্তুই ত্রিমাত্রিক বলিয়া ত্রিমাত্রিক স্থানের ধারণা আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ। বই, খাতা, দোয়াত, টেবিল, ঘর, বাড়ী, গাছ, পাহাড় প্রভৃতি সবই তো ত্রিমাত্রিক। ইহাদের দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার আছে, বেধ আছে। ইহাদের যে কোন বস্তুর যে কোন বিন্দুর স্থান নির্দেশ করিতে তিনটি সংখ্যা আবশ্যক হইবে।

স্থানের মাত্রা

স্থানাঙ্কের সংখ্যা দ্বারা স্থানের মাত্রা নির্দেশ হইয়া থাকে। এক, দুই ও তিনটি স্থানাঙ্ক দ্বারা যে স্থানের বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট হয়, সেই স্থানের (space) মাত্রা যথাক্রমে এক, দুই ও তিন। এই তিন প্রকারের স্থান আমাদের পরিচিত, অর্থাৎ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের এবং অনুভূতির গোচর। এখন, যদি এমন হয় যে কোন একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করিতে চারটি সংখ্যার আবশ্যক হইয়া পড়ে? তাহা হইলে যে স্থানে (space) ঐ বিন্দুটি অবস্থিত তাহাকে চতুর্মাত্রিক স্থান (four-dimensional space) বলিতে হইবে। তেমনি যদি

বহুমাত্রিক স্থান

কোন স্থানের বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করিতে পাঁচটি সংখ্যা বা স্থানাঙ্কের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চমাত্রিক স্থান (five-dimensional space) বলিতে হইবে। গণিতে (যেমন, গতি-বিজ্ঞানে) এমন অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা আছে, যাহাতে সমস্যান্তর্গত বস্তুগুলির পরিবর্তে একটি বিন্দু (representative point) ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত বস্তুগুলির অবস্থান, গতি প্রভৃতি নির্দেশ করিতে যে সকল সংখ্যা আবশ্যক হয়, সেগুলি উক্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক-রূপে পরিবর্তিত হয়। ফলে, সাধারণ ত্রিমাত্রিক স্থানের সমস্যার সমাধানকল্পে বহুমাত্রিক স্থানের অবতারণা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং গণিতে যে কোন মাত্রা-বিশিষ্ট স্থানের অবতারণা ও ব্যবহার অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে, ত্রিমাত্রিক স্থান সম্বন্ধে আমরা ধারণা করিতে পারি। কিন্তু চতুর্মাত্রিক বা বহুমাত্রিক স্থান সম্বন্ধে তো সেরূপ ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং ঐ সকল অচিন্ত্য ও অবোধ্য স্থানের অবতারণা করিয়া লাভ কি? প্রকৃত কথা এই যে স্থান কথাটি গণিতে অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ত্রিমাত্রিক স্থান বলিতে আমরা ঘর, বাড়ী, পথ, ঘাট, মাঠ, আকাশ প্রভৃতি বুঝি। কিন্তু গণিতের বহুমাত্রিক স্থান সেরূপ নহে। ইহা মামাবাড়ী বা কালীবাড়ীর মত এমন একটা জায়গা নয়, যেখানে খাওয়া যায়, শোওয়া যায়, আড্ডা দেওয়া যায়। গণিতীয় সমস্যার আলোচনা ও সমাধান পক্ষে যখন কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করিতে চার, পাঁচ বা বহুসংখ্যক স্থানাঙ্ক আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন আমরা বলি, ঐ বিন্দুটি চতুঃ, পঞ্চ বা বহুমাত্রিক

স্থানে অবস্থিত। এইরূপ একটা কল্পনা (assumption) আবশ্যক হইয়া পড়ে। এগুলি ঘরবাড়ী, পথঘাটের মত সাধারণ জ্ঞানগম্য অর্থাৎ চক্ষুকর্ণের গোচর হইবে কি না, সে প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক বা বহুমাত্রিক, যে কোন স্থানের (space) কল্পনাই করা যাক না কেন, শুধু একটা স্থানের কল্পনা মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায় না। তন্মধ্যে অবস্থিত বিন্দু, রেখা প্রভৃতির বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যদি একটি একমাত্রিক স্থান লওয়া যায়, অর্থাৎ যদি একটি সরল রেখা মাত্র কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে, ঐ সরল রেখার উপর অবস্থিত যে-কোন দুইটি বিন্দুর ব্যবধান, যে-কোন একটি বিন্দু হইতে অপর এক, দুই বা বহু বিন্দুর দূরত্ব, প্রভৃতির আলোচনা আবশ্যক হয়।

স্থানীয় জ্যামিতি

আবার যদি একটি দ্বিমাত্রিক স্থান (তল, plane) লওয়া যায়, তাহা হইলে, তন্মধ্যে অবস্থিত যে-কোন দুইটি বিন্দুর ব্যবধান, যে-কোন একটি বিন্দু হইতে অপর বিন্দুর দূরত্ব, দুই রেখার সমান্তরালত্ব, উক্ত স্থানে অঙ্কিত ত্রিভুজ, বৃত্ত বা অন্য প্রকার চিত্রাবলীর বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ তথ্যনিরূপণ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

যদি একটি ত্রিমাত্রিক স্থান লওয়া যায়, তাহা হইলেও, তন্মধ্যে অবস্থিত যে-কোন দুইটি বিন্দুর ব্যবধান, যে-কোন একটি বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুর দূরত্ব, দুইটি রেখার সমান্তরালত্ব, দুইটি রেখার মধ্যবর্তী কোণ, গোলক (sphere) শঙ্কু (cone) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা ও তথ্যনিরূপণ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

যে-কোন প্রকার যে-কোন মাত্রিক স্থানের বিবিধ তথ্য আলোচনা

ও বিচার যে বিষয়ের অন্তর্গত, তাহাকে উক্ত স্থানের জ্যামিতি বলে। এই জন্য একমাত্রিক স্থানের জ্যামিতিকে একমাত্রিক জ্যামিতি, দ্বিমাত্রিক স্থানের জ্যামিতিকে দ্বিমাত্রিক জ্যামিতি, বহুমাত্রিক স্থানের জ্যামিতিকে বহুমাত্রিক জ্যামিতি, প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির চর্চা বহু পুরাতন। মানুষের আবাসভূমি, শস্যক্ষেত্র, প্রভৃতির স্বত্বসংরক্ষণের জন্য আদিমকাল হইতেই ভূমির পরিমাণ নির্ণয়ের বিবিধ চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। এবং এই চেষ্টা হইতেই জ্যামিতির উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইউক্লিড কর্তৃক প্রণীত জ্যামিতিই পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত। বর্তমানকালে সর্বদেশে এই জ্যামিতিই সর্বাগ্রে অধীত হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারাই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অধিকাংশ জ্যামিতীয় গণনা সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এ পর্যন্ত স্থান, দূরত্ব, স্থানাঙ্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে সবই ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অন্তর্গত। ইউক্লিডীয় দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির মূল তথ্যগুলি হইতেই ত্রিমাত্রিক এবং বহুমাত্রিক ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উদ্ভব এবং বহুবিধ সম্প্রসারণ হইয়াছে।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতি কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, সমস্ত সমকোণই সমান। এই সত্যগুলি অমনিই বোঝা যায়। কোন প্রমাণের আবশ্যক হয় না। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির আর একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য এই : একটি সমতল ভূমিতে (plane) একটি সরল রেখা A B লওয়া যাউক। এই সমতলে এবং A B রেখাটির বাহিরে অবস্থিত

ইউক্লিডীয় জ্যামিতি

একটি বিন্দু P. এই P বিন্দুটির ভিতর দিয়া মাত্র একটি এমন সরল রেখা টানা যাইতে পারে, যাহা A Bকে ছেদ করিবে না। এই সত্যটি ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও, গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এই সত্যটিকে প্রমাণ করিবার বহু প্রকার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণ করা যায় নাই। বরং দেখা গিয়াছে,

P

A———————B
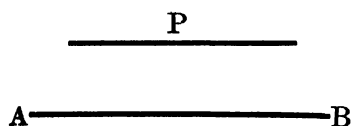
যে এই সত্যটি না মানিয়াও জ্যামিতীয় আলোচনা চলিতে পারে। উক্ত P বিন্দুর ভিতর দিয়া একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে, যেগুলি A Bকে ছেদ করিবে না। মোট কথা, উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য বাদ দিয়াও জ্যামিতি-শাস্ত্র রচনা করা যাইতে পারে। এই জ্যামিতিকে অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি বলা হইয়া থাকে। ইহার সূত্রপাত বহুকাল পূর্বে হইলেও ইহার সম্যক্ আলোচনা এবং প্রচার হইয়াছে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে। এই জ্যামিতি যে স্থানে (space) চলে, তাহাকে অনিউক্লিডীয় স্থান (Non-euclidean space) বলা হইয়া থাকে। এইরূপ স্থানে অবশ্য 'বিন্দু,' 'সরল রেখা', 'দুইটি বিন্দুর দূরত্ব', প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ যে ধারণা তাহা চলিবে না। এগুলি সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হইবে।

অনিউক্লিডীয় স্থান ও জ্যামিতি

একটি উদাহরণ লওয়া যাক। পৃথিবীটাকে একটা গোলক ধরিয়া লইয়া ইহার পৃষ্ঠদেশকে একটি দ্বিমাত্রিক স্থান মনে করা

যাইতে পারে। কারণ একটি গোলকের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত যে কোন বিন্দু দুইটি স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্ধারণ করা যায়। মনে করা যাক, আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশমাত্রই জানি, ইহার অভ্যন্তর আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। এস্থলে A এবং B দুইটি বিন্দুর দূরত্ব বলিলে, আমরা বুঝিব A হইতে B পর্য্যন্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া অঙ্কিত রেখাসমূহের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সেইটির দৈর্ঘ্য। সমতল ভূমিতে যেমন এই রেখাটিকে সরল রেখা বলা হয়, তেমনি ভূপৃষ্ঠের এই রেখাটিকেও আমরা 'সরল রেখা' বলিতে পারি, কারণ ভূপৃষ্ঠস্থ রেখা ব্যতীত অন্য কোন রেখার জ্ঞান বা অনুভূতি আমাদের নাই, ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। দেখা যাইবে, এইরূপ সরলরেখা দ্বারা অঙ্কিত ত্রিকোণ প্রভৃতিতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নিয়ম খাটিবে না। যদি কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ পরস্পর যুক্ত করিয়া (ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া) একটি ত্রিভুজ আঁকা যায়, তাহা হইলে এই ত্রিভুজের অন্তর্গত তিনটি কোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান হইবে না। গোলকের উপরিস্থিত যে দ্বিমাত্রিক স্থান, ইহাকে একটি অনিউক্লিডীয় স্থান বলা যাইতে পারে। ইহার জ্যামিতি অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি।

অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি বহুপ্রকারের হইতে পারে। জ্যামিতির বিভিন্নতা অনুসারে স্থানেরও (space) বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি উক্ত বহুপ্রকার অনিউক্লিডীয় জ্যামিতির একটি বিশিষ্ট রূপ। গণিতে স্থানের অর্থ অনেক ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে স্থান, যে স্থানে গাছ জন্মে, ফুল ফোটে, বাতাস বয়, শুধু সেই স্থানে আবদ্ধ থাকিলে গণিতের চলে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

ইউক্লিডীয় স্থান অতিক্রম করিয়া গণিত এখন অতীন্দ্রিয় অনিউক্লিডীয় স্থানে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে।

সমান্তরাল-রেখাসম্পর্কীয় উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি উল্লঙ্ঘন করিয়া যেমন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সীমারেখা উত্তীর্ণ হইয়া অনিউক্লিডীয় স্থানে পৌঁছান যায়, তেমনি অপর একটি পথ দিয়াও আমরা অনিউক্লিডীয় স্থানের কল্পনা করিতে পারি। এই পথ হইতেছে ইউক্লিডের প্রথম খণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞাটিকে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারেঃ যদি A B C একটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়, এবং A C ইহার কর্ণ হয়, তাহা হইলে
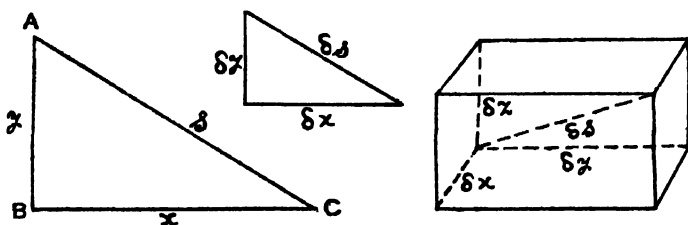
$AC^2 = AB^2 + BC^2$ হইবে। যদি BC, AB এবং AC-এর দৈর্ঘ্যকে যথাক্রমে x, y এবং s ধরা যায়, তাহা হইলে, $s^2 = x^2 + y^2$ হইবে। যদি এই ত্রিকোণটি খুব ছোট হয় এবং ইহার ছোট বাহুগুলিকে x, y, s না বলিয়া δx, δy, δs বলা যায়, তাহা হইলে, $\delta s^2 = \delta x^2 + \delta y^2$ হইবে। ইউক্লিডীয় সমস্ত দ্বিমাত্রিক স্থানে এই নিয়ম খাটিবে। তেমনি ইউক্লিডীয় ত্রিমাত্রিক স্থানে, $\delta s^2 = \delta x^2 + \delta y^2 + \delta z^2$ হইবে।

কিন্তু এমন হইতে পারে যে, কোন স্থান (space) এরূপ

যে তথায় একটি ছোট সমকোণী ত্রিভুজ আঁকিলে, $\delta s^2 = \delta x^2 + \delta y^2$ না হইয়া $\delta s^2 = \frac{1}{2}\delta x^2 + 3\delta y^2$, বা $\delta s^2 = y\delta x^2 + x\delta y^2$, বা $\delta s^2 = a\delta x^2 + b\delta y^2$ (a এবং b দুইটি সংখ্যা) হয়। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ স্থানকে ইউক্লিডীয় বলা যাইবে না। এবং এরূপ স্থানের জ্যামিতিকেও ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বলা যাইবে না। উপরোক্ত সম্বন্ধটিকে ত্রিমাত্রিক স্থানের বেলায় $\delta s^2 = a\delta x^2 + b\delta y^2 + c\delta z^2$ লেখা যাইতে পারে। আরও একটু ব্যাপকভাবে লইলে এই সম্বন্ধটিকে $\delta s^2 = a\delta x^2 + b\delta y^2 + c\delta z^2 + f\delta y\delta z + g\delta z\,\delta x + h\delta x\delta y$ এইরূপে প্রকাশ যাইতে পারে। অর্থাৎ এমন স্থান কল্পনা করা যায় যেখানে উপরোক্ত সূত্র খাটিবে। এইরূপ একটা সূত্র অবলম্বন করিয়া যে জ্যামিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাকে রীমানীয় (Riemannian) জ্যামিতি বলা হইয়া থাকে। উপরোক্ত সূত্রটি ত্রিমাত্রিক স্থান নির্দেশ করিতেছে। আরও ব্যাপকভাবে, x, y, z প্রভৃতি স্থানাঙ্কের সংখ্যা বাড়াইয়া, উপরোক্ত সূত্রদ্বারা বহুমাত্রিক রীমানীয় স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

রীমানীয় জ্যামিতি

গণিতের স্থান-কল্পনার ইহাই শেষ কথা নয়। আরো অনেক প্রকারে নানাবিধ স্থানের কল্পনা করা হইয়া থাকে। তবে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় স্থানের কল্পনাই যথেষ্ট।

যে কোন স্থানের পরিচয় এবং আলোচনার পক্ষে দূরত্বের পরিমাপ অত্যাবশ্যক। আমরা দূরত্বের পরিমাপ করি কোন একটা এককের (unit) সাহায্যে। যব, অঙ্গুলি, বিঘৎ, হাত, প্রভৃতি বহুবিধ

একক সাধারণ দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গণিতের পক্ষে আরও ভাল এবং আরও শুদ্ধ একক আবশ্যক।

দূরত্বের পরিমাপ

ইংলণ্ডে ইঞ্চি, ফুট, গজ, প্রভৃতি দৈর্ঘ্যের এককরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক জগতে মিটার (metre), সেন্টিমিটার, প্রভৃতির চলন বেশি। উত্তর মেরু হইতে বিষুবরেখার যে দূরত্ব, তাহার এক কোটি ভাগের এক ভাগকে এক মিটার বলা হয়। ক্ষুদ্র দূরত্বের জন্য সেন্টিমিটার, মিলিমিটার, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অধিক দূরত্বের জন্য কিলোমিটার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন অনেক বেশি দূরত্বের পরিমাপ আবশ্যক হয়, তখন আলোক-সেকেণ্ড (অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে আলো যত দূর যায়, প্রায় ১৮৬০০০ মাইল বা ৩০০০০০ কিলোমিটার) বা আলোক-বর্ষ (অর্থাৎ এক বৎসরে আলো যত দূর যায়) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অনেক সময়ে ইহা অপেক্ষাও বহুগুণ বড় এককের ব্যবহার আবশ্যক হইয়া থাকে।

কাল

কাল বা সময় সম্বন্ধে সকলের মনেই একটা ধারণা আছে, অথচ ইহা যে কি, তাহা এক কথায় প্রকাশ করা যায় না। কাল সম্বন্ধে মানুষের মনে যে ধারণা আছে, তাহাও একটি মৌলিক ধারণা। অন্য কোন বস্তু বা ধারণার সহিত তুলনা করিয়া, অন্য কোন বস্তু বা ধারণার লক্ষণ, ধর্ম বা প্রকৃতি আলোচনা করিয়া, অথবা ইন্দ্রিয়লব্ধ অন্য কোন জ্ঞান বা অনুভূতির সহায়তা লইয়া ইহা বুঝিতে পারা যাইবে না। সময় সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা আছে, তাহা অন্য সকল প্রকার ধারণা ও অনুভূতি হইতে পৃথক্।

কালের ধারণা

আমরা সর্বদাই বলি, 'আমার সময় নাই', 'এ কাজটি করিতে অনেক সময় লাগিবে', 'সব সময়ে সব কথা ভাল লাগে না', 'অল্প সময়ে বেশি কাজ করিতে গেলে কাজ খারাপ হয়', 'একই কাজ করিতে কারও বেশি সময় লাগে, কারও কম সময় লাগে', 'যখন দুর্গে তোপ পড়ে, ঠিক তখনই গির্জার ঘড়িতে একটা বাজে', 'সব স্কুল এক সময়ে বসে না', 'প্রত্যহ একই সময়ে সূর্যোদয় হয় না', 'বেলগাছিয়া হইতে ডালহৌসি স্কোয়ারে যাইতে যে সময় লাগে, টালিগঞ্জ হইতে ডালহৌসি স্কোয়ারে যাইতেও সেই সময় লাগে', ইত্যাদি। এই সকল কথা হইতে বেশ বুঝা যায়, যে সময়ের অস্তিত্ব, সময়ের অল্পতা, সময়ের আধিক্য, দুইটি সময়ের সমতা (equality of two intervals of time), এককালীনতা (simultaneity), প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা আছে। সময় জিনিষটা

কি তাহা বুঝাইয়া বলিতে না পারিলেও, কম সময়, বেশি সময়, সমান সময়, প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে।

সময় সম্বন্ধে আমাদের মনে আরও একটা ধারণা আছে, সেটা কম বা বেশি, সমান বা অসমান, এ সব ধারণা হইতে পৃথক্। আমাদের মনে হয় সময় চলিয়া যাইতেছে, সময় বহিয়া যাইতেছে। কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উত্তাপ প্রভৃতি ধর্মের (property) যেমন ন্যূনতা, আধিক্য প্রভৃতি আছে, সময়েরও সেইরূপ ন্যূনতা, আধিক্য আছে। কিন্তু কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য আপনা আপনি বহিয়া যায় না, আপনা আপনি বাড়িয়া যায় না। কিন্তু টেবিলের উপর একটা দোয়াত রাখিলে, দোয়াতের অস্তিত্বের সময়টা আপনা আপনি বাড়িয়া চলে। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, এক দিন, দুই দিন, এমনি করিয়া দোয়াতের অস্তিত্বের সময়, অর্থাৎ দোয়াতের বয়স বাড়িয়া চলে। কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা বাড়ানো, কমানো বা ঠিক রাখা আমাদের ইচ্ছা, কার্য বা অবস্থার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাহার বয়স বা অস্তিত্বের সময় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাড়িয়া চলে, কাহারও সাধ্য নাই, তাহার প্রতিরোধ করে। সত্যই, সময় বহিয়া যায়, কারো তরে না দাঁড়ায়!

কাল-প্রবাহ

এই কালস্রোতের আর একটা গুণ, ধর্ম বা বিশেষত্ব এই যে এই প্রবাহ শুধু একদিকে। এই স্রোতের জোয়ার-ভাটা নাই। ক্রমাগত একদিকে বহিয়া যাইতেছে। সময় বহিতেছে, যে কোন নূতন দ্রব্য ক্রমশঃ পুরাতন হইতেছে। সময় কিন্তু আর উল্টা বহিবে না, পুরাতন জিনিষ আর নূতন হইবে না। মানুষ ক্রমশঃ শৈশব, কৈশোর,

যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য অতিক্রম করিবে, কিন্তু সময় আর ফিরিবে না। বৃদ্ধ ফিরিয়া আর শিশু হইতে পারিবেন না। এই একমুখী প্রবাহ কালের একটি মৌলিক বিশেষত্ব। ইহা অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে বহে, ভবিষ্যৎ হইতে অতীতের দিকে ইহার গতি নাই।

সময়ের অল্পতা, আধিক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকিলেও ইহার পরিমাপের (measurement) একটা ব্যবস্থা আবশ্যক।

সময়ের পরিমাপ

দৈর্ঘ্য, বিস্তার, ওজন প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন, কাল সম্বন্ধেও তেমনি একটি একক (unit) নির্দেশ করা আবশ্যক। কোন সুনির্দিষ্ট এককের সাহায্যে পরিমাপ না করিলে যেমন দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা যায় না, তেমনি সুনির্দিষ্ট এককের সাহায্যে পরিমিত না হইলে, কালের ন্যূনতা আধিক্য সম্বন্ধেও নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব হইবে না। একই সময় কারো কাছে বেশি, কারো কাছে কম মনে হয়। শূল-বেদনাক্রান্ত রোগীর কাছে যে সময়টা অতি দীর্ঘ দূরতিক্রম্য বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই সময়টিই হাসি গল্পে মত্ত বালকের কাছে অতি অল্প, অতি দ্রুত মনে হয়। নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির কাছে যে সময়টা অল্প বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই সময়টাই কর্মক্লান্ত ব্যক্তির নিকট অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং শুধু মনের ধারণা দ্বারা সময়ের পরিমাপ সম্ভব নয়। দৈর্ঘ্য, বিস্তার, প্রভৃতি সম্বন্ধেও যেমন শুধু অনুমান বা কল্পনা নির্ভুল হইতে পারে না, তেমনি কাল সম্বন্ধেও শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

দৈর্ঘ্য, গুরুত্ব, প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্য যেমন এক একটি নির্দিষ্ট

একক (unit) ব্যবহৃত হয়, তেমনি সময়ের পরিমাপের জন্যও নির্দিষ্ট একক আবশ্যক। কালের একক-নির্ণয় অন্য প্রকার একক-নির্ণয় হইতে একটু পৃথক্। কালের একক নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমেই জগতের একটি সাধারণ নিয়ম স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই নিয়মটিকে প্রকৃতির সাম্য (Uniformity of Nature) বলা যাইতে পারে। এই নিয়মটি এই যে, একই অবস্থা-সমূহের সমন্বয়ে জড়-জগতে ঠিক একই ফল উৎপন্ন হইবে। যেমন, আগুনে হাত দিলে যদি হাত পোড়ে, তাহা হইলে যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে আগুনে হাত দিলেই হাত পুড়িবে। আগুনে হাত দিলে কখনো পুড়িবে, আবার কখনো পুড়িবে না, এরূপ হইবে না। একটি ঢালু স্থানের উপর হইতে একটি বল গড়াইয়া দিলে, সেটা মাটিতে পড়িতে খানিকটা সময় লাগিবে। ঠিক একই স্থান হইতে যদি একই বল বার বার গড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, প্রতিবারই বলের গতি ঠিক একরূপই হইবে। এক একবার এক এক প্রকার হইবে না। জড়-জগতে প্রকৃতির ব্যবহারে যদি এই সাম্য না থাকিত, তাহা হইলে, কোন প্রকার জ্ঞানলাভই সম্ভব হইত না। আকাশে একটা বল ছুঁড়িয়া দিলে, যদি তাহা কখনও মাটিতে আসিয়া পড়িত, আবার কখনও উপরে উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে, বলের গতি সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই করিতে পারিতাম না। এক স্থান হইতে, একই অবস্থায়, একই বল, একই প্রকারে যতবার ছোড়া যাইবে, ততবারই উহার গতি ঠিক একই প্রকার হইবে। এরূপ হয় বলিয়াই আমরা বলের গতির নিয়ম সঠিক বুঝিতে পারি, এবং এই নিয়ম বুঝিতে

প্রকৃতির সাম্য

পারিলে, অন্য স্থান হইতে অন্য একটি বল, অন্য প্রকারে ছুঁড়িলে তাহার গতি কিরূপ হইবে, তাহা হিসাব করিয়া বলিতে পারি। প্রকৃতির এই সাম্য বর্তমান না থাকিলে জড়-জগতের কোন নিয়মই আমরা আবিষ্কার করিতে পারিতাম না।

মনে করা যাক, একটি নির্দিষ্ট মাপের চৌবাচ্চায় জল ভরিয়া, চৌবাচ্চার নীচে একটি নির্দিষ্ট মাপের ছিদ্র করা গেল। এই ছিদ্র দিয়া জল ক্রমাগত বহিয়া যাইতে থাকিবে এবং ক্রমশঃ চৌবাচ্চাটি খালি হইয়া যাইবে। যদি অন্য কোন সময়ে, অন্য কোন স্থানে, ঠিক ঐ মাপের চৌবাচ্চায় জল ভরিয়া চৌবাচ্চার নীচে ঠিক ঐ মাপের ছিদ্র করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত চৌবাচ্চা হইতে যেরূপে জল বাহির হইয়াছিল, এই চৌবাচ্চা হইতেও ঠিক সেইরূপে জল বাহির হইবে। পূর্বোক্ত চৌবাচ্চা শূন্য হইতে যে সময় লাগিবে, শেষোক্ত চৌবাচ্চা শূন্য হইতেও ঠিক সেই সময় লাগিবে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট মাপের চৌবাচ্চা হইতে একটি নির্দিষ্ট মাপের ছিদ্র দিয়া জল বাহির হইতে যে সময় লাগে, সে সময়টাও একটা নির্দিষ্ট সময়। এই সময়টিকে সময়ের একক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। চৌবাচ্চাটিকে দুইবার ভরিয়া দুইবার খালি করিতে যে সময় লাগে, তাহা পূর্বোক্ত এককের দুইগুণ; সুতরাং এই সময়টিকে 'দুই' সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। যদি উক্ত এককটিকে 'ঘণ্টা' নাম দেওয়া যায়, তাহা হইলে, এই সময়টির পরিমাণ 'দুই-ঘণ্টা' হইবে। এই এককের সাহায্যে যে কোন সময়ের পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

সময়ের একক

চৌবাচ্চা এবং জলের সাহায্যে সময়ের একটা একক নির্দিষ্ট করা সম্ভব হইলেও, জিনিষটি ব্যবহারের পক্ষে খুব সুবিধাজনক নহে। উহা দ্বারা সময়ের সূক্ষ্ম পরিমাপও সম্ভব হয়। ভরা চৌবাচ্চা হইতে জল বাহির হইয়া যাইবার সময়টা যেমন নির্দিষ্ট এবং যতবার ইচ্ছা জল ভরিয়া এবং জল ছাড়িয়া দিয়া ঐ নির্দিষ্ট সময়ের একাধিক পুনরাবৃত্তি করা যায়, তেমনি, যদি একটা যন্ত্র নির্মাণ করা যায়, যাহার কোন একটি নির্দিষ্ট অংশ (চৌবাচ্চার যেমন জল) একটি নির্দিষ্ট সময়ে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া যায় (যেমন চৌবাচ্চা হইতে জল বাহির হইয়া যায়), তাহা হইলে, ঐ নির্দিষ্ট সময়টিকে একক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই জাতীয় যন্ত্রের সাধারণ নাম ঘড়ি। ইহা এমনভাবে নির্মিত যে ইহার কাঁটা ঠিক একই সময়ে ঠিক একই পরিমাণ ঘোরে। একবার ঘুরিয়া আসিতে একটি কাঁটার যে সময় লাগে, আর একবার ঘুরিতেও ঠিক সেই সময় লাগিবে; কারণ দুই বারেই ঘড়ির প্রতি অংশের অবস্থা ঠিক একরূপই থাকায়, প্রকৃতির সাম্য (uniformity of nature) অনুসারে, কাঁটার গতিও ঠিক একই প্রকার হইবে। সুতরাং একটি কাঁটার একবার ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহাকে সময়ের একক ধরিয়া লইয়া যে কোন সময়ের পরিমাপ করা যাইতে পারে।

ঘড়ি

যে কোন একটা দৈর্ঘ্যকে যেমন 'গজ' বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহাকে দৈর্ঘ্যের এককরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তেমনি কোন ঘড়ির কাঁটার একবার ঘুরিবার সময়কেই একক বলিয়া

ধরা যাইতে পারে। একক ছোট হউক, বড় হউক, পরিমাপের পক্ষে উভয়ই সমান। আমরা যে দৈর্ঘ্যকে গজ বলি, গজটা যদি তার চেয়ে ছোট বা বড় হইত, তাহাতে কোন ক্ষতি হইত না, কোন অসুবিধাও হইত না। তেমনি ঘড়ির কাঁটা একবার ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, সেটা যাহাই হউক না কেন, তাহাকে 'ঘণ্টা' বা 'সময়ের একক' বলা যাইতে পারে। তাহাতে যে কোন সময়ের পরিমাপের পক্ষে কোন ক্ষতি নাই। ক্ষতি নাই, কিন্তু অসুবিধা আছে। বিশেষ অসুবিধা আছে বলিয়াই সময়ের একক নির্ণয় একটা বিশেষ প্রণালীতে করা আবশ্যক। 'গজের' মত যে কোন একটা সময়কে একক বলিয়া ধরা যায় না।

এখন, দেখা যাক, অসুবিধাটা কি। মনে করা যাক, একটা ঘড়ি আছে, যার কাঁটা যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে একবার ঘোরে।

সৌর দিন

এই সময়টাকেই এক ঘণ্টা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাক। প্রাতে উঠিয়া ঘড়ির কাঁটা ঠিক করিয়া দেওয়া গেল—পাঁচটা বাজিল। তারপর ছয়টা, সাতটা, আটটা, বাজিয়া চলিল। দিনের নানা প্রকার কাজের সময় এই ঘড়ি দ্বারা স্থির করা গেল। কোন কাজ দুই ঘণ্টায় হইয়াছে, কোন কাজে তিন ঘণ্টা লাগিয়াছে, কোন কাজ আধ ঘণ্টায় হইয়াছে, ইত্যাদি। এ পর্যন্ত কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু পরদিন প্রাতে (ঠিক যে সময়ে পূর্বদিন ঘড়ি ঠিক করা হইয়াছিল) উঠিয়া হয়তো দেখা গেল, ঘড়িতে নয়টা বাজিয়াছে। কি মুস্কিল! যদি এই ঘড়ি মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে, কখন বা চা খাওয়া হইবে, কখন বা চাকর বাজারে যাইবে, কখন বা ছেলেমেয়েরা স্কুলে

যাইবে, আর কখন বা আপিস রওয়ানা হইতে হইবে? আমাদের দৈনন্দিন যত কিছু কাজ, সবই সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রভৃতি সময়ের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আমাদের কর্মময় দিনের কার্যতালিকা নির্ভর করে সূর্যদেবের উদয় এবং অস্তের উপর। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দিয়াই আমাদের সকল কাজের সময় নিরূপণ করা হয়। সুতরাং আমাদের ঘড়ির সময়ের এককের সঙ্গে সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে সময়, তাহার একটা সম্বন্ধ থাকা দরকার। এই সম্বন্ধ যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে একদিন প্রাতে পাঁচটা, আর তার পরদিন প্রাতে নয়টা, এরূপ হইবে না।

অতএব এক কাজ করা যাক। সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে সময়, সেই সময়টা ধরা যাক, একদিন। এই সময়টাকে চব্বিশ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে বলা যাক এক ঘণ্টা। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যাহাতে সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত চব্বিশবার ঘোরে, এরূপ ব্যবস্থা করা হউক। তাহা হইলে এই ঘণ্টার সাহায্যে সমস্ত কাজের সময় ঠিক করা যাইবে। সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে দিন তাহাকে 'সৌর দিন' বলা যাইতে পারে।

ব্যবস্থাটা আপাতত ভাল মনে হইলেও, ইহাতেও মুস্কিল আসান হইল না। কারণ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয়ের মধ্যে যে সময়টা, সে সময়টা একেবারে নির্দিষ্ট নয়। কখনও একটু কম, কখনও একটু বেশি হয়। সুতরাং ঘড়ির কাঁটা সমান ভাবে চলিলে, সূর্যের সঙ্গে মিল থাকিবে না। অথচ ঘড়ির কাঁটা কখনো আস্তে চলিবে, আবার কখনো জোরে চলিবে, এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ, তাহাতে সময়ের এককের সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ

থাকিবে না। এককের এককত্ব লোপ পাইবে। যে 'গজ' কখনো ছোট, কখনো বড় হয়, তাহা দিয়া পরিমাপ চলে না।

দেখা যাক, অন্য উপায় আছে কি না। পৃথিবী ইহার অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। চলন্ত ট্রেণ হইতে যেমন দুই পাশের গাছপালা, টেলিগ্রাফের থাম, প্রভৃতিকে বিপরীত দিকে ছুটিতে দেখা যায়, তেমনি এই ঘূর্ণ্যমান পৃথিবী হইতে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ঘুরিতে দেখা যায়। চৌবাচ্চার জল-নির্গমণ বা ঐ জাতীয় অন্য উপায়ে দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর একবার ঘুরিবার যে সময় তাহা সুনির্দিষ্ট। তাহার কম-বেশি হয় না। সুতরাং কোন একটি নক্ষত্রের উদয় হইতে পরবর্তী উদয় পর্যন্ত যে সময়, সে সময়টি নির্দিষ্ট। এই সময়টিকে 'নাক্ষত্র দিন' বলা যাইতে পারে। ইহাকে চব্বিশ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে এক ঘণ্টা বলা যাইতে পারে। ঘড়ির কাঁটার এই ঘণ্টা অনুসারে ঘুরিতে কোন বাধা নাই। এই ঘণ্টাকে একক করিয়া যে কোন সময়ের পরিমাপ করা যায়। জ্যোতিষীর পক্ষে এই নাক্ষত্র ঘণ্টা, নাক্ষত্র দিন এবং নাক্ষত্র ঘড়ি (sidereal clock) সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।

নক্ষত্র দিন

কিন্তু দৈনন্দিন কাজের পক্ষে এ ঘড়ির ব্যবহার চলিবে না। তাহার কারণ এই যে নাক্ষত্র দিন সৌর দিনের চেয়ে প্রায় চার মিনিট ছোট। সুতরাং প্রত্যহ এই ঘড়ি প্রায় চার মিনিট করিয়া ফাস্ট হইয়া যাইবে। ফলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে এই ঘড়ির কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। একদিন সূর্যোদয়ের সময়ে এই ঘড়িতে যদি সাড়ে

পাঁচটা বাজে, তাহা হইলে পরদিন সূর্যোদয়ের সময়ে দেখা যাইবে, প্রায় পাঁচটা চৌত্রিশ মিনিট, তারপর দিন প্রায় পাঁচটা আটত্রিশ, এবং এইরূপে কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাইবে প্রাতে ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া আছে। সুতরাং এ ঘড়িতে দৈনন্দিন কাজ চলিতে পারে না।

এখন উপায় ? আমাদের ঘড়ির সূর্যোদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা চাই। অথচ সূর্য মহাশয় প্রতিদিন সারা বৎসর ঠিক একভাবে চলিবেন না। সুতরাং তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া চলা যায় কিরূপে ? সূর্যের যে গতি আমরা দেখিতে পাই, তাহা ট্রেণ হইতে দৃষ্ট গাছপালার গতির মত আপেক্ষিক গতি। এই গতির আসল কারণ পৃথিবীর গতি, একটা আহ্নিক আর একটা বার্ষিক। সূর্যের এই আপেক্ষিক বা আপাত গতির বৈলক্ষণ্যের কারণ দুইটি। প্রথম কারণ এই যে সূর্যের বার্ষিক পথ (ecliptic) বিষুবরেখা হইতে ভিন্ন এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে পৃথিবীর পথ (orbit of the earth round the sun) ঠিক বৃত্তাকার নয়, ইহা উপবৃত্তীয় (elliptic). এই দুই কারণে সূর্যের আপাত গতিতে দৈনন্দিন বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। কারণ যাহাই হউক, উহার পরে মানুষের কোন হাত নাই। এখন এমন একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের একক, একটা নির্দিষ্ট দিন, একটা নির্দিষ্ট ঘণ্টা পাওয়া যায়, অথচ সেটা সূর্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে।

মনে করা যাক, কালীঘাট হইতে শ্যামবাজার যে বাস চলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইবে, অথচ কখনো আস্তে, কখনো জোরে চলা যাইবে না। এস্থলে একমাত্র উপায় এই যে, একখানা প্রাইভেট গাড়ী লইয়া বাসের সঙ্গে ঠিক সময়ে ছাড়িয়া, একই

সময়ে বাসের সঙ্গে অপর প্রান্তে পৌঁছিতে হইবে। গাড়ীখানি অবশ্য সর্বদা ঠিক একই স্পীডে চলিবে। এরূপ ব্যবস্থায় দেখা যাইবে, যে গাড়ীখানি ঠিক বাসের গায়ে গায়ে না থাকিলেও, কখনও একটু আগে এবং কখনও একটু পিছনে থাকিবে। কখনও কখনও হয়তো এক সঙ্গেও থাকিবে। কারণ বাস তো সর্বদা এক স্পীডে চলে না। এ ব্যবস্থায় গাড়ীখানি মোটের উপর বাসের কাছাকাছি থাকিবে অথচ সর্বদা সমান স্পীডে চলিবে। এইরূপে, মনে করা যাক, আসল সূর্যটা যেন বাস, কখনো আস্তে চলে, কখনো জোরে। আর একটা কল্পিত-সূর্য বা মধ্য সূর্য (mean-sun) কল্পনা করা যাক, যেটা আসল সূর্যের মত ঠিক এক বৎসরেই এক পাক ঘোরে, কিন্তু ঠিক সমান বেগে, প্রাইভেট গাড়ীর মত। তাহা হইলে এই নকল সূর্যটি আসল সূর্যের ঠিক গায়ে গায়ে না থাকিলেও উহার কাছে কাছে থাকিবে। কখনও একটু আগে, কখনও একটু পিছনে। আবার কখনও হয়তো ঠিক একত্র হইবে। এই নকল সূর্যটির গতি সর্বদা সমান; সুতরাং এই নকল সূর্যের উদয় হইতে উদয় পর্যন্ত যে সময়, সেটা সুনির্দিষ্ট।

কল্পিত সূর্য

এই সনয়াককল্পিত বা মধ্য সৌর দিন (mean solar day) বলা যাইতে পারে। সৌর দিন কখনও ইহা হইতে একটু ছোট, আবার কখনও একটু বড় —কিন্তু পার্থক্য বেশি নহে। এই নকল সৌর-দিনকে চব্বিশ ভাগ করিয়া যে ঘণ্টা হয়, তাহাকে দৈনন্দিন কাজের সময়ের একক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আমরা সর্বদা যে ঘড়ি ব্যবহার করি, তাহার এক ঘণ্টা এই নকল সূর্যের এক ঘণ্টা।

মধ্য সৌর দিন

আসল সূর্য যখন উদিত হয়, তখন নকল সূর্যটি একটু আগে বা একটু পিছনে থাকে। সেই জন্যই প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময়ে ঘড়িতে ঠিক এক সময় থাকে না। আসল সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে আসে, তখন নকল সূর্য ঠিক সেখানে আসে না। সেই জন্য তখন ঘড়িতে প্রত্যহ ঠিক বারটা বাজে না। আসল সূর্যের সময় এবং কল্পিত সূর্যের যে সময় তাহার পার্থক্য (equation of time) পনর যোল মিনিটের বেশি কখনই হয় না। কাজেই আসল সূর্যের পরিবর্তে নকল সূর্য অনুসারে ঘড়ি চলিলে কাজের কোন অসুবিধা হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কীয় বা অনুরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে নাক্ষত্র দিন বা নাক্ষত্র ঘণ্টা সময়ের এককরূপে ব্যবহার করা চলিতে পারে। অন্য সর্বত্র নকল সৌরদিন ও ঘণ্টাই ব্যবহৃত হয়।

কাল শোধন

আমাদের ঘড়ি সব সময়ে ঠিক চলে না। ঘড়ি ঠিক আছে কি না, তাহা জানিতে হইলে আমরা হয় তোপের সঙ্গে, নতুবা রেডিও-সিগন্যালের সঙ্গে মিলাই। যদি রেডিও অফিসে গিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, তাঁহারা ঠিক সময় কোথায় পাইলেন, তাঁহারা বলিবেন, অব্জারভেটরি হইতে। অব্জারভেটরিতে নক্ষত্র, সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের গতি পর্যবেক্ষণের যন্ত্র আছে। সেখানে নক্ষত্রের গতি ও অবস্থান হইতে নাক্ষত্র ঘড়ির সময় ঠিক করা হইয়া থাকে। সূর্যের গতি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া সৌর সময় স্থির করা যায়। সৌর সময় এবং কল্পিত সৌর সময়ের যে পার্থক্য (equation of

time) বা কাল-শোধন, সেটাও প্রতিদিনের জন্য খুব নির্ভুলরূপে গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করা আছে। সুতরাং নকল সৌর সময়, অর্থাৎ আমাদের ঘড়ির সময়, তাহা হইতে সহজেই স্থির করা যায়।